বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ৯১-১১৪
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ কতদূর যেতো?

আবুল বারকাত*

এ প্রবন্ধের মূল বিষয়টি প্রবন্ধের শিরোনামেই স্ব-ব্যাখ্যায়িত : "বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ কতদূর যেতো?" বিষয়টি নিয়ে বিগত ১০-১৫ বছরে ইতোমধ্যে কয়েক দফা লিখেছি, বক্তব্য দিয়েছি। আর সবশেষে ২০১৫ সালে প্রকাশিত "বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ" শীর্ষক একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি এ নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি (প্রকাশক: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা)। বঙ্গবন্ধুর ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত আজকের সেমিনারে উল্লেখিত গবেষণা গ্রন্থে বিবৃত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিই হবে আমার বক্তব্যের মূল ভিত্তি।

মূল শব্দ: *বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন, বৈষম্যহীন অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র, প্রতিবিপ্লব, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সেনাশাসন, মৌলবাদের অর্থনীতি ও রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত, 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, জিডিপি, জিএনআই 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশ, জাতীয় আয়ে উল্লম্ফন, সংশয়-সন্দেহবাদী কূটতর্কবাগীশ*

১. 'বঙ্গবন্ধু-দর্শন'-এর স্বরূপ ও বঙ্গবন্ধু হত্যা

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীন দেশ, যেখানে জনগণ এবং একমাত্র জনগণই সার্বভৌম। মুক্তি সংগ্রামে অর্জিত এই দেশের মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধু কমপক্ষে দু'টি বিষয় নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। আজ থেকে ৪৬ বছর আগে মহান মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে জনগণের মৌল আকাঙ্ক্ষা ছিল: প্রথমত, বৈষম্যহীন এক অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র গঠন; আর দ্বিতীয়ত, অসাম্প্রদায়িক (secular) মানসকাঠামো বিনির্মাণ। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঐ আকাঙ্ক্ষার কাজটি ঠিকঠাকই

* অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান অর্থনীতি বিভাগ; অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।ফোন: ০১৭৫৬১৪২৩১৫, ই-মেইল: barkatabul71@gmail.com

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ কতদূর যেতো?" শীর্ষক সেমিনারের জন্য রচিত মূল প্রবন্ধ, ঢাকা: ১২ আগস্ট ২০১৮

শুরু হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী তিন-চার বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত-লন্ডভন্ড বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষামুখী ছিল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জীবনটা যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত মাত্র ৫৫ বছরের (১৯২০-৭৫)। সুদীর্ঘ ৩৮ বছরে (১৯৩৭-১৯৭৫) লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছিল বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন-বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, যারই ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল তার রাজনৈতিক দর্শন এবং এ ধারাবাহিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই গড়ে উঠেছিল বঙ্গবন্ধুর স্বকীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি-উন্নয়ন দর্শন ("বঙ্গবন্ধু দর্শন" এর মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ছক ১-এ দেখানো হয়েছে)। 'বঙ্গবন্ধু-দর্শন' কোনো অলৌকিক বিষয় নয়। এ দর্শনের বিনির্মাতা বঙ্গবন্ধু নিজেই; এবং সময় (time) ও পরিপ্রেক্ষিত (context) এ বিনির্মাণে সহায়ক মাত্র; এ এক সচেতন-সৃজনশীল কর্মফল।

বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন (বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি), রাজনৈতিক দর্শন এবং উন্নয়ন (প্রগতি) দর্শনে নিঃসন্দেহে ভূমিকা রেখেছিল সমসাময়িক বিশ্বের রাজনৈতিক ঐতিহাসিক পরিবর্তনসমূহের মিথস্ক্রিয়া। এসব পরিবর্তনের অন্যতম হলো ১৯১৭ সালে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব—রুশ বিপ্লব এবং রুশ বিপ্লব পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্রুতগতি আর্থ-সামাজিক মৌলিক পরিবর্তন (যে সময়কালে বঙ্গবন্ধুর বয়স ১৫-২০-এর কোঠায়); সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভাব এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা; ১৯২৯-৩৩ সালে মহামন্দায় (great depression) আর্থসামাজিক সিস্টেম হিসেবে পুঁজিবাদের প্রথম বৈশ্বিক পতন-লক্ষণসমূহ যা শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গিয়ে ঠেকলো (এ সময়কালে বঙ্গবন্ধুর বয়স ১০ বছর থেকে ২৫ বছর); দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে একদিকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার আবির্ভাব এবং অন্যদিকে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার সাথে সমাজতন্ত্রের স্নায়ুযুদ্ধ (যখন বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ২৫ বছর থেকে ৩৫ বছর); দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে বিশ্বজুড়ে ঔপনিবেশিকতাবিরোধী আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে ঔপনিবেশসমূহে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের

ছক ১: বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন, রাজনৈতিক দর্শন, উন্নয়ন দর্শন—
যোগসূত্র এবং মূলনীতি-ভিত্তিসমূহ

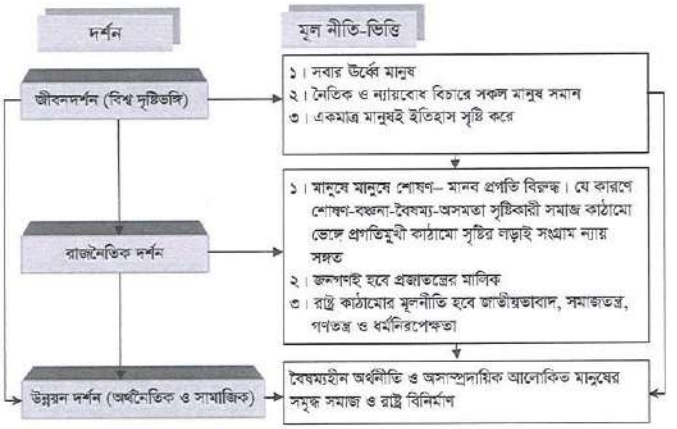

উৎস: আবুল বারকাত (২০১৫), বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ, পৃ. ৩৮।

অভ্যুদয় এবং এ আন্দোলনে ভারতবর্ষে বঙ্গবন্ধুর অংশগ্রহণ (যখন বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ২৮ বছর থেকে ৪০ বছরের মধ্যে); ১৯৪০-৫০ এর দশকে সমাজতান্ত্রিক চীনা বিপ্লব, চীনের অগ্রযাত্রা ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব (যখন বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ২৫ থেকে ৪০ বছর); ১৯৬০-এর দশকে তৃতীয় বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন যেমন ল্যাতিন আমেরিকায় বিশেষত পানামা, ইকুয়েডর, নিকারাগুয়ায় মার্কিন আগ্রাসন, কিউবার বিপ্লব ও বিপ্লবী চেগুয়েভারা হত্যা (যখন বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ৪০ থেকে ৫০ বছর); ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও বিশ্বব্যাপী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনবিরোধী আন্দোলন (যখন বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ৪৪ থেকে ৫০ বছর); দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের অসারতা এবং পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈর-সেনা-সামন্ত শাসনের আওতায় শোষণ-নির্যাতনসহ বৈষম্যপূর্ণ দুই অর্থনীতি সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে চিরস্থায়ী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি (এ সময়কালে বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ২৭ বছর থেকে ৫০ বছর)।

বঙ্গবন্ধুর উল্লিখিত দর্শনের মূর্ত রূপই হলো ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের গণ-আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু কি এমন হলো যে ঐ জন-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হলো না। এর মূল কারণ কি? আমার মতে কারণটি এরকম: বঙ্গবন্ধু যে দিন থেকে (১৯৭২ সালের ২৬ মার্চে প্রথম স্বাধীনতা দিবসে বঙ্গবন্ধুর ভাষণে) সমাজতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক-জাতীয়তাবাদী-ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের কথা বলছেন, বলছেন নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনায় পুরাতন অর্থনৈতিক ও সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলতে হবে ঠিক তখন থেকেই ইতোপূর্বে সংগঠিত-সংঘবদ্ধ দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারী প্রতিবিপ্লবীরা আরও দ্রুতলয়ে আরও বেশি শক্তি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর দর্শনবিরোধী তাদের ষড়যন্ত্র-কর্মকাণ্ড জোরদার করল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের দালাল মোশতাক—তাহের উদ্দিন ঠাকুর- মাহবুবুল আলম চাষী চক্রের ষড়যন্ত্র; জিয়াউর রহমানসহ কতিপয় প্রতিক্রিয়াশীল সেনা সদস্যের সরকার পতনের ষড়যন্ত্র; ঔপনিবেশিক মানসিকতার আমলাতন্ত্র; দুর্নীতি[১] সুযোগের অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে থাকা রাজাকার-আলবদর-আল শামসসহ জামায়াতে ইসলামের ষড়যন্ত্র; মূল্যস্ফীতি ডবল ডিজিটে পৌঁছে দেওয়ার সফল ষড়যন্ত্র; খাদ্য গুদাম লুট, মজুতদারসহ[২] খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা অকেজো করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের পিএল ৪৮০-র আওতায় সবচে মারাত্মক মারণাস্ত্র "খাদ্যের রাজনীতি" প্রয়োগ (উপলক্ষ হিসেবে শর্ত দিয়েছিল আমরা সমাজতান্ত্রিক কিউবায় পাট বেচতে পারব না)—এসবই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মূল পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেশে চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করল। প্রকৃত সত্য হলো বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্ন নিশ্চিহ্ন করা নিশ্চিত করা হলো।সৃষ্টি করা হলো এমনই অস্থিতিশীল ও জটিল পরিস্থিতি যে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পরিবার পরিজনসহ হত্যা করলেও কেউ সংগঠিতভাবে রুখে দাঁড়াবে না। প্রতিবিপ্লবী এ শক্তি তাদের দীর্ঘদিনের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের

১. পাকিস্তানি কারাগার থেকে ফিরে এসে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন "... বাংলার মাটি থেকে করাপশন উৎখাত করতে হবে। করাপশন আমার বাংলার কৃষকরা করে না। করাপশন আমার বাংলার মজদুর করে না। করাপশন করি আমরা শিক্ষিত সমাজ"।

২. ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বেতার-টেলিভিশন ভাষণে মজুতদারদের হুঁশিয়ার করে বঙ্গবন্ধু বললেন "বিপুল খাদ্য ঘাটতি আমাদের জন্য এক দুঃসহ অভিশাপ। ... সামনের কয়েক সপ্তাহ আমাদের জন্য ঘোর দুর্দিন। ... এ প্রসঙ্গে আমি মজুতদার, চোরাকারবারি ও গুজববিলাসীদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, তারা যেন নিরন্ন মানুষের মুখের রুটি নিয়ে ছিনিমিনি না খেলে—তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করা হবে।" অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খাদ্য মজুত ও চোরাকারবার নিয়ে ষড়যন্ত্রটা হয় শুরু থেকেই। এ ষড়যন্ত্র স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বৃহৎ ষড়যন্ত্রের অংশ মাত্র।

কাজটি দক্ষতার সাথেই সম্পন্ন করে ফেললো—১৯৭৫-এর ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে। এই একই খুনি চক্র কারাগারে আটক চার জাতীয় নেতাকেও (সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও মো. কামরুজ্জামান) হত্যা করল।

১৯৭৫ সালে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ঐ দুই মৌল আকাঙ্ক্ষার **সোনার বাংলাদেশ** গঠনের স্বপ্নকেই হত্যা করল। বঙ্গবন্ধু হত্যার মাধ্যমে শুধু যে আমাদের সোনার বাংলা গড়তে দেওয়া হয়নি তা-ই নয়, সেই সাথে সবধরনের দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র হয়েছে যে কীভাবে স্বাধীন বাংলাদেশকে পশ্চাৎমুখী করে একটি প্রগতিবিরুদ্ধ অকার্যকর রাষ্ট্রে (failed state)এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বশংবদ রাষ্ট্রে পরিণত করা যায়। আর সে কারণেই পরবর্তীকালের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় লাগাতার সেনা শাসন, স্বৈরতন্ত্র, সেনা শাসনের মোড়কে গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি তোষণ ও পোষণ, মৌলবাদের অর্থনীতির ও রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত—এসবের ফলে সম্পূর্ণ সচেতনভাবেই দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করা হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে সামরিক শাসন ও স্বৈরতন্ত্রের ধারা; দেশি-বিদেশি দুর্বৃত্তদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণে সামরিক ছাউনিতে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; সামরিক ফরমানের মাধ্যমে জনগণের স্বার্থবিরুদ্ধ বিষয়াদি বিশেষত "ধর্মনিরপেক্ষতা" সংশ্লিষ্ট ১৯৭২-এর সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি কর্তন-পরিবর্তন করে বিলুপ্ত করা হয়েছে; স্বাধীনতাবিরোধী নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীকে রাজনীতিতে পুনর্বাসন করা হয়েছে; যুদ্ধাপরাধীসহ সকল সাম্প্রদায়িক শক্তিকে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করা হয়েছে; শুধু পুনর্বাসনই নয় স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ বিরোধী রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতাদের রাষ্ট্রক্ষমতার-সরকারের অংশীদার করা হয়েছে; সন্ত্রাস, কালোটাকা ও পেশিশক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে "নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনায় পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা উপড়ে ফেলার" যে কথাটি বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন সেটাকেই অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা হয়েছে। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশ পরিচালনার দায়িত্বে যে বা যারাই থাকেন না কেন চালকের আসনে কোনো না কোনোভাবে শক্তভাবে বসে পড়েছেন তারা যারা নিজেরা কোনো সম্পদ সৃষ্টি করেন না—যারা অন্যের সম্পদ হরণ, দখল, বেদখল, জবরদখল, আত্মসাৎকরণের মাধ্যমে অনুপার্জিত আয়কারী লুটেরা শ্রেণি (যাদের বলা হয় Rent-Seeker) হিসেবে সরকার ও রাজনীতিব্যবস্থাকে তাদের অধীনস্থ-কব্জাগত করতে চান। এটাই ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী আমাদের ইতিহাসের মূল কথা। এ মূল কথা ভুলে গেলে ইতিহাস বিকৃতি হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সামনে এগুনো অসম্ভব হবে।

২. বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব থেকে ২৫ বছর বঞ্চিত হলাম!

যেহেতু বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে অর্জিত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে তাঁরই উদ্ভাবিত "দেশের মাটি উত্থিত উন্নয়নদর্শন" (home grown development philosophy)বাস্তবায়নের মাধ্যমে শোষণমুক্ত, সমাজতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক, আলোকিত মানুষের সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা' গড়তে চেয়েছিলেন এবং যেহেতু বঙ্গবন্ধুর এ উন্নয়নদর্শনবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং তাদের দেশীয় দালাল-দোসররা মতাদর্শগত কারণেই বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বর্জন করেছিল, সেহেতু প্রতিক্রিয়াশীল ঐ চক্রের দিক থেকে যুক্তিযুক্ত ছিল তাদের পরিকল্পিত ঐক্যবদ্ধ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে বর্বরভাবে হত্যা করা—এটাই ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু স্বাধীন দেশের মানুষের ঐতিহাসিক সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যতে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে এ প্রশ্ন উত্থাপন যুক্তিযুক্ত যে, **বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বাংলাদেশের অর্থনীতি-সমাজ আজ কোথায় দাঁড়াতো? কতদূর পর্যন্ত যেতে পারতো বাংলাদেশ? বৈশ্বিক অর্থনীতি-সমাজে বাংলাদেশের**

অবস্থানটা কী হতে পারতো? এ প্রশ্নের ১০০ ভাগ সদুত্তর দেবার ক্ষমতা কারও নেই। কারণ এ এক জটিল সম্ভাবতা নিরূপণ সংশ্লিষ্ট (possibilities বা probability)প্রশ্ন। তবে জটিল এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান অযৌক্তিক নয়। অনেক ধরনের অনেক বৈশিষ্ট্যের যুক্তিসিদ্ধ, বিজ্ঞানসম্মত অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে অঙ্ক কষে এ প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। ঐসব অনুসিদ্ধান্তসহ আমার হিসেবপত্তর পেশ করার আগে আবারও বলে রাখা উচিত যে বাংলাদেশের বয়স এখন ৪৬ বছর। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরের বাংলাদেশের বয়স ৪৫ বছর, আর ইতিহাসের বর্বরতম-নৃশংসতমভাবে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা পরবর্তী 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের বয়স ৪৩ বছর। উল্লেখ জরুরি যে, বঙ্গবন্ধুকে যখন বিদেশি-দেশি ষড়যন্ত্রকারীরা হত্যা করল, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৫৫ বছর, যার মধ্যে জীবনের শেষের মাত্র সাড়ে ৩ বছর অর্থাৎ মাত্র ১ হাজার ৩১৪ দিন তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের শাসনকাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ জরুরি যে, এ দেশে উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজে মানুষের গড় আয়ু বেড়ে এখন যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে তাও যদি বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হিসেবে ধরে নেওয়া যায়, তাহলেও সুস্থ-সবল-সুঠাম দেহের অধিকারী বঙ্গবন্ধু (১৯৭৫-এর পরে) আরও কমপক্ষে ২৪-২৫ বছর তো বাঁচতেন (কমপক্ষে বলছি এ জন্য যে বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে দেশের ঊর্ধ্বমুখী মানব উন্নয়নের কারণে মানুষের গড় আয়ু এখনকার তুলনায় কমপক্ষে ৫ বছর বেড়ে যেতো)। অর্থাৎ বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন-প্রগতি কর্মযজ্ঞ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে কমপক্ষে ২৪-২৫ বছর।

৩. বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' কোথায় পৌঁছতো বাংলাদেশ: পদ্ধতিতাত্ত্বিক বিষয়াদি

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বাংলাদেশের অর্থনীতি-সমাজ আজ কোথায় পৌঁছাতো! হিসেবপত্তর করে [যাকে অর্থশাস্ত্রসহ বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বিজ্ঞানীরা সিমুলেশন (simulation model)বলে থাকেন] এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পাঁচটি পদ্ধতিতত্ত্বীয় (methodological)বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথমত: কয়েকটি যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্ত (hypothesis) ব্যবহার করা হয়েছে; আর অনুসিদ্ধান্ত ব্যবহার করা হয়েছে এ কারণে যে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে বিদেশি-দেশি প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ইতিহাসের নৃশংসতম ও বর্বরোচিতভাবে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে অর্থাৎ ১৯৭৫ পরবর্তী বাংলাদেশ হলো "বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশ নয়"—"বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশ" বা "আজকের বাংলাদেশ"। হিসেব-পত্তরের ভিত্তি হিসেবে আমি যেসব অনুসিদ্ধান্ত ব্যবহার করেছি তা নিয়ে যে কেউই বিতর্ক করতে পারেন (এ বিষয়ে পরে আসছি)। পদ্ধতিতত্ত্বীয় দ্বিতীয় বিষয়টি হলো "বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশ" অর্থাৎ "আজকের বাংলাদেশ" (যা সরকারি পরিসংখ্যান এবং/অথবা ক্ষেত্র বিশেষে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দেশভিত্তিক পরিসংখ্যানিক তথ্য-উপাত্ত **ব্যবহার করে** হিসেব-পত্তর করা হয়েছে) এবং "বঙ্গবন্ধুসহ আজকের বাংলাদেশ" (যা সিমুলেশন মডেল ভিত্তিক আমার হিসেব)। আর তুলনার ক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার অর্থনীতিকে বেছে নিয়েছি। দেশ হিসেবে অন্য যেকোনো দেশ বেছে নেওয়া যেতো, তবে তা না করে মালয়েশিয়াকে বেছে নেওয়ার পেছনে প্রধানত দুটি কারণ রয়েছে। কারণ দুটি হলো (১) ১৯৭০-৭৩ সময়কালে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও মোট জাতীয় আয় (জিএনআই) ছিল প্রায় সমান। তবে ১৯৭০ সালে মালয়েশিয়ার মোট জনসংখ্যা ছিল আমাদের (পূর্ব পাকিস্তানের) তুলনায় প্রায় ৬.৫ গুণ কম (আমাদের ছিল ৬ কোটি ৯১ লক্ষ আর মালয়েশিয়ার ১ কোটি ৬ লক্ষ)। যে কারণে মোট দেশজ উৎপাদন অথবা মোট জাতীয় আয় সমান বা কাছাকাছি হলেও মালয়েশিয়ার মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন অথবা মাথাপিছু জাতীয় আয় আমাদের তুলনায় ৫-৬ গুণ বেশি হবে সেটাই স্বাভাবিক—তাইই ছিল ১৯৭০-৭৩-এর দিকের অবস্থা। (২) মালয়েশিয়ার অর্থনীতি

বিনির্মিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী নেতা ড. মাহাথির মোহাম্মদ-এর নেতৃত্বে এবং বলা যায় "দেশের মাটি-উত্থিত উন্নয়নদর্শনের" ভিত্তিতে। সমজাতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব এবং "দেশজ উন্নয়নদর্শন" উভয়ই আমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ততদিন, যতদিন বঙ্গবন্ধু দেশ পরিচালনে নেতৃত্ব দিয়েছেন (অর্থাৎ ১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি থেকে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের ভোর রাত পর্যন্ত)। তবে মালয়েশিয়ার সাথে আমাদের পথচলা শুরুর একটা বড় পার্থক্য আছে, তা হলো আমাদের পথচলার শুরুটা (ধরা যাক ১৯৭২ সাল) যুদ্ধবিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপ[৩] থেকে আর মালয়েশিয়ার পথচলা শুরু কোনো যুদ্ধবিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপ থেকে নয়। আরও একটা বড় পার্থক্য আছে যা অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত; আর তা হলো মালয়েশিয়ার নেতৃত্ব "সমাজতন্ত্রের" কথা বলেননি—ড. মাহাথির মোহাম্মদআসলে নিয়ন্ত্রিত মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রবক্তা ছিলেন, আর আমাদের বঙ্গবন্ধু তাঁর উন্নয়নদর্শনের অন্যতম প্রধান অবিচ্ছেদ্য মৌল হিসেবে সমাজতন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন (যা সংবিধানের চার মূল স্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ)। পদ্ধতিতাত্ত্বিক তৃতীয় বিষয়টি হলো 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের সম্ভাব্য চিত্র বিনির্মাণে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও মোট জাতীয় আয়-এর গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার ৫ শতাংশ, ৬ শতাংশ, ৭ শতাংশ, ৮ শতাংশ, ৯ শতাংশ ও ১০ শতাংশ ধরে ভিন্ন ভিন্ন হিসাব (সিমুলেশন) করা হয়েছে। তবে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজের সম্ভাব্য চিত্র উপস্থাপনে মোট দেশজ উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয়ের গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ হলে যা দাঁড়াতো সেটাকেই সবচে যুক্তিযুক্ত মনে করেছি। গড়ে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ ধরার পেছনের যৌক্তিক কারণগুলো পরে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি। পদ্ধতিতত্ত্বগত চতুর্থ বিষয়টি হলো সময় বা সময়কালসংশ্লিষ্ট (বছর, বছরকাল)। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত পরিসংখ্যানের প্রাপ্যতা যা বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার তুলনা-সহায়ক হয় সেটাকেই মুখ্য বিবেচনা করা হয়েছে। যেমন মোট দেশজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ১৯৭০-২০১১ সময়কাল, মোট জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে ১৯৭৩-২০১১ সময়কাল ব্যবহৃত হয়েছে। পদ্ধতিতাত্ত্বিক সর্বশেষ, পঞ্চম ক্ষেত্রটি হলো মোট দেশজ উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয়সহ সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক চলকসমুহের মূল্যবিষয়ক (price)। বাংলাদেশের সাথে মালয়েশিয়ার অর্থনীতি তুলনীয় রাখার স্বার্থে মোট দেশজ উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয় (মাথাপিছুসহ) হিসেব করা হয়েছে ২০০০ সালের ভিত্তিতে স্থির মূল্যে (in constant price, বর্তমান মূল্য বা current price-এ নয়), আর মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় (পিপিপি ডলারে)[৪] হিসেব করা হয়েছে ২০০৫ সালের স্থির মূল্যে। বাংলাদেশি টাকা আর মালয়েশিয়ার রিংগিত-ভিত্তিক সব হিসেবপত্তর তুলনীয় করার স্বার্থে মার্কিন ডলারে রূপান্তর করা হয়েছে।

আগেই বলেছি, বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' অর্থাৎ 'বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশ'-এর অর্থনীতি ও সমাজ আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো তা নিরূপণে বেশকিছু যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হিসেবপত্তর করেছি। এসব যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই ধরে নিয়েছি যে "বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশের" মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার হতো ৯ শতাংশ। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেই বার্ষিক জিডিপি ৫.৫ শতাংশে উন্নীতকরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। যেসব অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে "বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশে" মোট দেশজ উৎপাদনের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ হতো সেসব

৩. এমন এক ধ্বংসস্তূপ থেকে যা বিশ্লেষণ করে ১৯৭২ সালের দিকেই বিদেশি বিশেষজ্ঞগণ ও অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলেন যে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ অত্যাসন্ন এবং অনাহারে ৫০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাবে।

৪. মাথাপিছু প্রকৃত আয় অর্থাৎ অর্থের (আমাদের ক্ষেত্রে টাকার আর মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে রিংগেট এর) ক্রয়ক্ষমতা অর্থাৎ এক একক অর্থ দিয়ে কি পরিমাণে পণ্য-দ্রব্য ক্রয় করা যায়। প্রায়শই এক্ষেত্রে পিপিপি ডলার (purchasing power parity dollar) ব্যবহার করা হয়।

অনুসিদ্ধান্ত উপস্থাপনের আগে নির্মোহ বস্তুনিষ্ঠতা নিশ্চিত করার স্বার্থে আর একটি বিষয় উত্থাপন জরুরি। বিষয়টি এ রকম—"বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশে" মোট দেশজ উৎপাদনের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ হতো কি না এ নিয়ে যে-কেউই তর্ক-বিতর্ক অথবা কূটতর্কে অবতীর্ণ হতে পারেন। এসব তর্কবাগীশদের প্রতি পেশাগত যথাযোগ্য সম্মানপূর্বক অন্তত কয়েকটি কথা বলা জরুরি। জরুরি গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো নিম্নরূপ:

প্রথমত: যে দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) পরিমাণে স্বল্প অথবা অপেক্ষাকৃত স্বল্প—সে দেশে সঠিক, ঐতিহাসিকভাবে বাস্তবায়নসম্মত, বিজ্ঞানসম্মত ও জনকল্যাণকামী অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নীতি-কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হলে ঐ দেশে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও তার প্রবৃদ্ধির হার বাড়তে বাধ্য। এমনকি প্রবৃদ্ধির হার সে দেশে দুই অঙ্কের (ডবল ডিজিট) হতে পারে অর্থাৎ ১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত। এ কোনো অসম্ভব প্রস্তাবনা নয়। এ উদাহরণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইতিহাসে নতুন কোনো বিষয়ও নয়। পৃথিবীর অনেক দেশই নির্দিষ্ট সময়কালে ইতিমধ্যে এ ধরনের উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

দ্বিতীয়ত: যে দেশের জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি অথচ মোট দেশজ উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কম—সে দেশে মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত সহজ। এক্ষেত্রে দুটি বিষয় নিশ্চিতকরণ জরুরি: (১) জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে, দক্ষ-জনশক্তিতে রূপান্তর, যে দক্ষ-প্রশিক্ষিত জনশক্তি উৎপাদন ক্ষমতা (productive capacity) বৃদ্ধি করে; (২) সে ধরনের অর্থনৈতিক নীতি-কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন যার দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক অভিঘাত (long-term social impact)ধনাত্মক।

তৃতীয়ত: 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে মোট দেশজ উৎপাদনের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশের পরিবর্তে ৭ শতাংশ ধরলেও 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয়—উভয়ই মালয়েশিয়ার তুলনায় অনেক বেশি হতো।

চতুর্থত: সংশয়বাদী, সন্দেহপ্রবণ, কূটতর্কবাগীশ ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা(!) বিদেশি-দেশি অর্থনীতিবিদ ও তথাকথিত সমাজ-রাষ্ট্রচিন্তকদের উদ্দেশ্যে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন জরুরি বোধ করি। প্রশ্নসমূহ সন্দেহাতীতভাবে রাজনৈতিক। রাজনৈতিক ঐ প্রশ্নসমূহ হলো: আপনারা কি ১৯৭০ সালেও ভাবতে পেরেছিলেন যে বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধ করব? আপনারা কি ভাবতে পেরেছিলেন যে আমরা ৯ মাসেই হাজার-লক্ষ প্রতিকূলতার মধ্যে একটি সশস্ত্র বলবান-নিয়মিত পাকিস্তানি হানাদার সেনাবাহিনী ও তাদের দেশীয়-আন্তর্জাতিক দালাল-দোসরদের বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করে ঐ 'অসীম শক্তিধর'(!) বর্বর পাকিস্তানি হানাদার সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারব? আপনারা কি ভেবেছিলেন যে আমরা এতই দুর্বল যে মুক্তিযুদ্ধকালীন মোশতাক চক্রসহ বিদেশি-দেশি ষড়যন্ত্রকারীরা আমাদের আবারও পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে যেকোনো ফর্মুলায় ফেরত যেতে বাধ্য করবে, আর আমরা তা মেনে নিতে বাধ্য হব? তারা সম্ভবত ভেবেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ প্রলম্বিত হবে এবং মুক্তিযোদ্ধাসহ তাঁদের সহযোগী এ দেশের আপামর জনগণ একপর্যায়ে হাঁপিয়ে উঠে রণেভঙ্গ দিয়ে হাটু গেড়ে ক্ষমা চাইবে। তারা সম্ভবত ভেবেছিলেন যে বঙ্গবন্ধু শুধু বক্তৃতা-পারদর্শী মানুষ, দেশ গড়া—তাও আবার অপূরণীয়-অপরিমেয় ক্ষয়ক্ষতিপূর্ণ যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ উন্নয়নে নেতৃত্ব দেওয়া তাঁর কাজ নয়; এ বিষয়ে নন তিনি বিশেষজ্ঞ—নন

তিনি পারদর্শী, সুতরাং পারবেন না তিনি। এসব প্রতিক্রিয়াশীল ভাবুকদের অনেকেই সচেতনভাবেই সাম্রাজ্যবাদের দালাল অথবা বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের কেরানি অথবা শাস্ত্রীয়ভাবে সে পক্ষের ব্যক্তি, যারা ক্ষুদ্রার্থের অর্থনীতিশাস্ত্রের বাইরে যেতে অপারগ[৫] অথবা 'জনগণের শক্তি সবকিছুর ঊর্ধ্বে'—এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী নন। আমি নিশ্চিত—এদের অধিকাংশই বঙ্গবন্ধুর যোগ্যতা-দক্ষতা-দেশপ্রেম সম্পর্কে জানতেন না অথবা ভাবতেন অর্থনীতি ও সমাজ উন্নয়নে দরিদ্রবিরোধী ধনিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী বৈষম্য সৃষ্টিকারী বাজারব্যবস্থাটাই উন্নয়নের একমাত্র মহৌষধ। উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধে ধ্বংস-বিধ্বস্ত বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের যখন খুবই প্রয়োজন ছিল, তখন বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্বে দাতা দেশগুলো দাবি তুলল যে, *"বাংলাদেশ যদি সাবেক পাকিস্তানের ঋণের দায়ের একাংশের (যে অংশ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়িত হয়েছিল বলে তারা দাবি করেছিল) দায়িত্ব গ্রহণ না করে, তবে বাংলাদেশকে তাদের পক্ষে সাহায্য প্রদান অসম্ভব"*। যাদের উদ্দেশ্যে এত কথা বলছি তারা কি জানেন যে ঐ দুর্দিনেও বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন *"দাতামহল দাবি না ছাড়লে আগামীকালই তারা চলে যেতে পারেন। আমরা সাহায্য নেবো না। ওইসব শর্তে আমরা সাহায্য নিতে পারি না"*। তারা কি জানেন, যে এ প্রক্রিয়ায় বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করলে বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থ ও নীতির প্রশ্নে অটল বঙ্গবন্ধু বিশ্বব্যাংকের ঐ ভাইস প্রেসিডেন্ট সাহেবকে স্পষ্ট বলেছিলেন *"শুনেছি আপনারা বলেছেন যে, বৈদেশিক সাহায্য পেতে হলে দাতামহলের শর্ত মানতে হবে আগে। ভদ্র মহোদয়গণ, এই যদি আপনাদের শর্ত হয়ে থাকে, তাহলে কোনো সাহায্যই আমরা নেবো না। আমাদের জনগণ রক্ত দিয়ে এ দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছে, এ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হলে, আমাদের বাঁচতে হলে জনগণের সে শক্তিকে কাজে লাগিয়েই বাঁচতে হবে। আমরা আপনাদের সাহায্য ছাড়াই চলবো"*[৬]।

এতক্ষণ যেসব সংশয়-সন্দেহবাদী কূটতর্কবাগীশ এ দেশি অথবা এ দেশের ভিনদেশি অথবা বিদেশি অর্থনীতিবিদ-সমাজচিন্তকদের উদ্দেশ্যে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করলাম এবং সেইসাথে বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম-নীতি-আদর্শ-জনগণের অপার শক্তির প্রতি আস্থার কিছু নমুনা উল্লেখ করলাম তাদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো ক্ষোভ-বিক্ষোভ-আক্রোশ-শত্রুতা নেই (আসলে এদের বেশির ভাগকেই আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব একটা চিনি না; তাদের লেখাজোখা পড়েছি মাত্র)। তবে এদের জন্য দুঃখ হয় এ জন্য যে, এদেরই বড় অংশ মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী কালে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এডিবিসহ সাম্রাজ্যবাদী বিভিন্ন সংস্থায় চাকরি করেছেন অথবা চাকরি থেকে অবসর নিয়ে (সম্ভবত দুদেশি পাসপোর্টধারী হিসেবে) হয় বিদেশে অথবা বাংলাদেশে এখন প্রত্যক্ষ সরকারঘনিষ্ঠ উন্নয়ন পরামর্শক (সরকারে যে দলই থাকুক না কেন)

---

৫. 'বুদ্ধিজীবী শ্রেণি'র একাংশ 'অর্থনীতিবিদ শ্রেণি' এসব 'ভাবুক' যারা ক্ষুদ্রার্থের অর্থনীতিশাস্ত্রের বাইরে বিচরণে অপারগ তাদের উদ্দেশ্যে বলা সমীচীন যে তাদের খুব দোষ নেই; দোষ অর্থনীতিশাস্ত্রেরই অন্তর্নিহিত; দোষ তারা অর্থশাস্ত্রের যে ধারা অথবা স্কুল অনুসরণ করেন সেখানেই বড় মাপের গলদ আছে। এ গলদ সাধারণ কোনো গলদ নয়। এ গলদ প্রধানত বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির ধারণাগত সংকট-উদ্ভূত—প্রকৃত সত্য উপলব্ধি না করতে পারার সংকট।

৬. এ অংশের অধিকাংশ তথ্য-উৎস হলো বঙ্গবন্ধু সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের স্মৃতিচারণ এবং মোতাহার হোসেন সুফী রচিত গ্রন্থ "ইতিহাসের মহানায়ক জাতির জনক", ২০০৯, ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী, পৃ. ৪০৫-৪০৭।

হিসেবে কাজ করছেন এবং/অথবা উন্নয়ন পরামর্শ-প্রেসক্রিপশন প্রদানকারী সংস্থার মালিক এবং/অথবা আমাদের দেশের "উন্নয়ন" কীভাবে কোন পথে হতে পারে এসব নিয়ে চিন্তা-দুশ্চিন্তার দোকান "Think Tank" খুলে বসেছেন!

আগেই বলেছি বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' ১৯৭৩ থেকে ২০১১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মোট দেশজ উৎপাদনের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াতো ৯ শতাংশ। এ হিসেব নিরূপণে বিভিন্ন যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ধরে নিয়েছি যে বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' ২০১১ সাল নাগাদ (তখন বঙ্গবন্ধুর বয়স হতো ৯০ বছর) তিনি মোট ৭টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্ণ সময়সহ অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম ৩ বছর সময় পেতেন। ধরে নিয়েছি যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) শেষ বছর নাগাদ প্রবৃদ্ধির হার গিয়ে দাঁড়াতো ৫.৫ শতাংশে (যে টার্গেট বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকীতেই ছিল)। ক্রমান্বয়ে একটি পর্যায় পর্যন্ত প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে ডাবল ডিজিটে (দুই অঙ্কে) উন্নীত হতো। বঙ্গবন্ধুর "স্বদেশজাত উন্নয়নদর্শনের" প্রভাব-অভিঘাত হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্ন সম্ভাবনাসহ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাসংশ্লিষ্ট বিষয়াদির যুক্তিতে ধরে নিয়েছি যে ঐ প্রবৃদ্ধির হার হতো: দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৭৮-৮৩) ৭.৫ শতাংশ, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৮৩-৮৮) ৮.৫ শতাংশ, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৮৮-৯৩) ৯.৫ শতাংশ, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৯৩-৯৮) ১০ শতাংশ, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৯৮-২০০৩) ১০.৫ শতাংশ, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (২০০৩-০৮) ১১ শতাংশ এবং অষ্টম পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে একই ধারা বজায় থাকতো অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির হার হতো ১১ শতাংশ।

বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সম্ভাব্য অনুমিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এসব হিসেব করলে ১৯৭৩ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত সময়কালে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার হতো বার্ষিক গড়ে ৯ শতাংশ। আর অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবৃদ্ধির হারে ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে শুধু মোট দেশজ উৎপাদনের কয়েক গুণ বৃদ্ধিই ঘটত না সেইসাথে ধরে নেওয়া অনুসিদ্ধান্তসমূহের বৈশিষ্ট্যের কারণে আর্থসামাজিক বৈষম্যও বহুগুণ হ্রাস পেত। আমার মতে এটাই ছিল বঙ্গবন্ধু উদ্ভাবিত "দেশের মাটি-উত্থিত উন্নয়নদর্শনের" অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য, যাকে এককথায় যেসব নামে সূত্রায়িত করা যায়, তা হলো— "বৈষম্য হ্রাসকারী ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মডেল" অথবা "বৈষম্য হ্রাসকারী প্রগতির মডেল" অথবা "বৈষম্য হ্রাসকারী উন্নয়ন মডেল" অথবা "অসমতা হ্রাসকারী প্রগতির মডেল" অথবা "অসমতা হ্রাসকারী উন্নয়ন মডেল"।

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' কী হতো, কেমন হতো অর্থনীতি ও সমাজের আজকের রূপ? সেক্ষেত্রে প্রক্ষেপণের (projections)ভিত্তি হিসেবে যেসব যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্ত বিবেচনা করা হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে অনুসিদ্ধান্তসমূহে যে পরিবর্তন ঘটে গেছে বা ঘটানো হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ:

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ১৯৭২-এর সংবিধানে বিধৃত চার মূলনীতির (জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ও) ভিত্তিতে জনগণের সার্বভৌমত্ব—জনগণই প্রজাতন্ত্রের মালিক (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭) ও জনগণের মৌলিক অধিকারসংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার অন্যতম হলো: মালিকানার নীতি (অনুচ্ছেদ ১৩), মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা (অনুচ্ছেদ ১৫), বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব (অনুচ্ছেদ ১৬) এবং ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য প্রদর্শন না করা (অনুচ্ছেদ ২৬), অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা (অনুচ্ছেদ ১৭), জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা (অনুচ্ছেদ ২০), নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য (অনুচ্ছেদ ২১), চিন্তা ও বিবেকের

স্বাধীনতা এবং বাক্‌স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৩৯), ধর্মীয় স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৪১), স্থানীয় শাসন (অনুচ্ছেদ ১১,৫৯,৬০), সংসদীয় গণতন্ত্র এবং আইন প্রণয়ন ও অর্থসংগ্রহ পদ্ধতি (অনুচ্ছেদ ৬৫-৯২), বিচার বিভাগসংশ্লিষ্ট বিধানাবলি (অনুচ্ছেদ ৯৪-১১৬), এবং নির্বাচনসংশ্লিষ্ট বিধানাবলি (অনুচ্ছেদ ১১৮-১২৬)। সেই সাথে সংবিধানের মূল বিধান অনুযায়ী ধরে নেওয়া হয়েছে যে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং "জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে [অনুচ্ছেদ ৭ (২)]—অর্থাৎ জনগণকে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না; মালিকানার নীতি সংবিধানে বর্ণিত বিধি মোতাবেক হতে হবে (অর্থাৎ বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ তুষ্টি চলবে না; রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের বেসরকারীকরণ সংবিধানবিরোধী); গ্রাম-শহরের বৈষম্য হ্রাস করবেন কিন্তু কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার করবেন না—তা হবে না; বস্তিবাসী বাড়তেই থাকবে—তা হবে না; জাত-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষে বৈষম্য প্রদর্শন করবেন—তা হবে না; শিক্ষাকে পণ্যে (বা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বিদ্যাবস্তু'তে) রূপান্তরিত করবেন—তা সম্পূর্ণ সংবিধানবিরোধী; ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসী মানুষকে নিরন্তর উচ্ছেদ প্রক্রিয়াভুক্ত করে রাখবেন—তা হবে না; স্থানীয় শাসনব্যবস্থা কার্যকর করবেন না—তা সম্পূর্ণ সংবিধানবিরোধী; সমাজতন্ত্রের নাম-নিশানা নেবেন না—তা হবে না; ধর্মকে রাজনীতির মধ্যে টেনে আনবেন—তা শুধু সংবিধানবিরোধীই নয় তা মুক্তিযুদ্ধের মৌলচিন্তাবিরোধী; শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য বাড়াতেই থাকবেন—তা চলবে না; অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ অন্য কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপন করবেন—তা হবে না; আইনের শাসনের ব্যত্যয় ঘটাবেন—তা হবে না।

২. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে (বাস্তবে হয়নি; পরিকল্পনাকাল ছিল ১৯৭৩-৭৮ আর বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয় ১৯৭৫-এ)।

৩. বঙ্গবন্ধু প্রস্তাবিত গণমুখী সমবায় আন্দোলন বাস্তবায়িত হয়েছে (যা বাস্তবে হয়নি), যার অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল বাধ্যতামূলক বহুমুখী সমবায়সহ গ্রামীণ কৃষক সমবায়, তাঁতী সমবায়, জেলে সমবায়, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায়।

৪. অর্থনীতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছে (যা আসলে হয়নি)—খাদ্য উৎপাদন ও কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধিসহ বৈদেশিক পরনির্ভরশীলতা হ্রাসের মাধ্যমে।[৭]

৫. মানবসম্পদসহ প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে[৮] (যা আসলে হয়নি)।

---

৭. বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের শেষ জনসভায় (২৬ মার্চ ১৯৭৫, রেসকোর্স ময়দানে) বলেছিলেন "আমি ভিক্ষুক জাতির নেতা থাকতে চাই না"। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল "বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা ৬২ শতাংশ থেকে ১৯৭৭-৭৮ এর মধ্যে ২৭ শতাংশের মধ্যে কমিয়ে আনা"।

৮. মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাব ছিল জ্ঞান-সমৃদ্ধ দক্ষ-প্রশিক্ষিত জনশক্তি গঠনের এবং এ লক্ষ্যের কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল ১৯৭৪ এর দিকে। এসব সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন মানুষের অভিজ্ঞান-সচেতনতা-দক্ষতা বৃদ্ধি পেত অন্যদিকে অর্থনীতিতে মানুষের উৎপাদনশীলতা, উৎপাদন সক্ষমতা ও ফলপ্রদতা বৃদ্ধি পেত। প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার কথা বঙ্গবন্ধু বহুবার বলেছেন এবং সর্বশেষ বলেছেন ১৯৭৫-এর ২৬ মার্চ জীবনের শেষ জনসভার ভাষণে।

৬. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার কর্মকাণ্ড সাংবিধানিক ও ন্যায়বিধানিক দৃষ্টিতে বাস্তবায়িত হয়েছে (যা আসলে হয়নি)।

৭. জাতীয়করণকৃত কলকারখানা-ব্যাংক-বীমা প্রতিষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত পরিকল্পিত উন্নয়ন ও উত্তরোত্তর বিকাশ হয়েছে (যা আসলে হয়নি)।

৮. অবকাঠামোর কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হয়েছে—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিলে যার ভবিষ্যৎ নির্দেশনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল রাস্তাঘাট-ব্রিজ, কালভার্ট, জলপথের/নদীর নাব্য রক্ষা করে দেশব্যাপী একক জলপথ-জাল, সমুদ্র-নদী-স্থলবন্দর, বিদ্যুৎ-জ্বালানি ব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে (যা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে হয়নি)।

৯. সরকারি স্বাস্থ্যখাতে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় স্তরের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের বিস্তৃতি ও মান বৃদ্ধি হয়েছে (যা কাঙ্ক্ষিত পরিকল্পনানুযায়ী আসলে হয়নি)।

১০. লাইসেন্স পারমিট ও সংশ্লিষ্ট ঘুষ-দুর্নীতি নির্মূল হয়েছে (আসলে আদৌ হয়নি। যা ১৯৭৪-এর দিকে পরিলক্ষিত হয় এবং যা rent-seeker-দের এক নব্য-ধনী গোষ্ঠী সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে কারণে বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের শেষ জনসভার ভাষণে—২৬ মার্চ ১৯৭৫—বলেছিলেন *"পাকিস্তান সব নিয়ে গেছে, কিন্তু এই চোরাদের তারা নিয়ে গেলে বাঁচতাম"*)।

১১. পাকিস্তানি বর্বর সেনাদের দালাল-দোসর যুদ্ধাপরাধী ও মানবাধিকার চরম লঙ্ঘনকারীদের বিচার ও বিচারিক রায় কার্যকর হয়েছে (যা আসলে হয়নি। প্রক্রিয়াধীন। এ প্রক্রিয়ার শেষ হবে কবে—কেউই জানে না। এরাই পরবর্তীকালে একদিকে যেমন বঙ্গবন্ধু সরকারবিরোধী ও দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক ছিল আর অন্যদিকে এরাই ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয়ে মৌলবাদের অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক জঙ্গিত্বের বাহক হলো)।

১২. পাকিস্তানফেরত সেনা কর্মকর্তাদের পুনর্বাসিত করা হলো না (আসলে করা হলো। বস্তুত এরাই তারা, যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কোনো কিছুই ধারণ করতেন না, বরঞ্চ উল্টোটাই করেছেন। আর এদের অনেকেই এখন ভেতর থেকে অথবা বাইরে থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন)।

১৩. মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টাতেই যেসব বাঙালি আমলা পাকিস্তানিদের স্বার্থ রক্ষার্থে নিয়োজিত ছিল তাদের পুনর্বাসিত না করে শাস্তি দেওয়া হলো (বাস্তবে হয়েছিল ঠিক উল্টোটা। ঐসব আমলার অনেককেই পুনর্বাসিত করা হলো। ঐ আমলারা মানসিকভাবে ছিলেন উপনিবেশিক ও মুসলিম লীগ—সামন্তবাদী মানসিকতার আমলা। চেয়ারে বসিয়ে যাদের দিয়ে আর যা-ই হোক সংবিধানের চার মূল স্তম্ভের কোনোটিই বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল না)।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' যে বাংলাদেশ হবার কথা ছিল সে বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা যায়নি। সেই সাথে এটাও বলা দরকার যে, বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' উপরোল্লিখিত অনুসিদ্ধান্তসমূহের কোনটা কোন মাত্রায় অথবা কোন অনুসিদ্ধান্তের মান কত হতো তা বলা দুষ্কর। তবে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' মূল অনুসিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর হতো এবং অনুসিদ্ধান্তসমূহের যৌথ মিথস্ক্রিয়ায় সৃষ্টি হতো নতুন এক বাংলাদেশ যাকে আমি বলছি "বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশ"। যে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতো কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় এবং বৈষম্য হ্রাস পেত অনেক গুণ। হিসেব-পত্তর কষে এসব বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে যা পেয়েছি তা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। তার আগে

আবারও স্মরণ করে দিতে চাই যে, ১৯৭০-২০১১ অথবা ১৯৭৩-২০১১ সময়কালের জন্য বৃহৎ বর্গের মানদণ্ডে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে দেখা হয়েছে দু'ভাবে: "আজকের বাংলাদেশ" (অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার ফলে যে বাংলাদেশ পেয়েছি অথবা 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশ') এবং 'বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশ' (অর্থাৎ যদি বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকতেন' এবং উল্লিখিত অনুসিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত হতো)। আর এ দুই বাংলাদেশকে তুলনা করা হয়েছে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের মালয়েশিয়ার একই সময়ের অর্থনীতির সাথে। সেই সাথে অর্থনীতিতে পরিবর্তন-রূপান্তরের পাশাপাশি সমাজের শ্রেণিকাঠামোতে কি ঘটেছে এবং কি ঘটতে পারতো সেটাও হিসেব-পত্তর করে দেখানোর চেষ্টা করেছি।

৪. বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' কেমন হতো আমাদের অর্থনীতি ও সমাজ?

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং উল্লিখিত অনুসিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর হলে (যা বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যর কারণেই অবশ্যই কার্যকর হতো বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের কার্যকারিতার মাত্রা যাই হোক না কেন) অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিরিখে ২০১১ সালের দিকের 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের অর্থনীতি মালয়েশিয়ার অর্থনীতিকে অনেকগুণ ছাড়িয়ে যেতো যদিও ১৯৭৩ সালের দিকে ঐ দুই অর্থনীতির অবস্থা মোটামুটি একই রকম ছিল। সেইসাথে আর্থ-সামাজিক শ্রেণিগত বৈষম্যের চেহারা কাঠামোটি পাল্টে যেতো এবং শ্রেণিবৈষম্য হ্রাস পেয়ে তা সমতাভিমুখী হতো যা আজকের বাংলাদেশে চরম বৈষম্যমূলক এবং যে পরিবর্তনটি মালয়েশিয়ায় আদৌ হয়নি (বিষয়টি পরে বিস্তারিত বিশ্লেষিত হয়েছে)।

প্রথমে আসা যাক বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বড় দাগে অর্থনৈতিক পরিবর্তনটা কেমন হতে পারতো, কোন অবস্থায় দাঁড়াতো ২০১১ সালের দিকে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়ার অর্থনীতির তুলনায় সম্ভাব্য অবস্থাটা কেমন হতো? 'বঙ্গবন্ধুসহ' আজকের[৯] (২০১১ সালের) বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) হতো ৪২ হাজার ১৫৮ কোটি ডলার যা একই সময়ের মালয়েশিয়ায় ১৫ হাজার ৪২৬ কোটি ডলার অর্থাৎ ২০১১ সালে বাংলাদেশের জিডিপি মালয়েশিয়ার তুলনায় ২.৭৩ গুণ বেশি হতো (লেখচিত্র ১); এমনকি মাথাপিছু জিডিপি মালয়েশিয়াকে ছাড়িয়ে যেতো—মালয়েশিয়ার মাথাপিছু জিডিপি ৫,৩৪৫ ডলার আর 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে আমাদের হতো ৬,০৬১ ডলার (লেখচিত্র ২)। আর এটা ঘটত তখন যখন আমাদের মোট জনসংখ্যা মালয়েশিয়ার চেয়ে প্রায় ৪ গুণ বেশি (১৯৭০ সালে ৬.৫ গুণ বেশি ছিল, লেখচিত্র ৩ দেখুন)। এতো গেল মোট দেশজ উৎপাদনের কথা। সংগত কারণেই মোট জাতীয় আয়ের (জিএনআই) ক্ষেত্রেও 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের অনুরূপ উর্ধ্বগামী পরিবর্তনের ফলে ২০১১ সাল নাগাদ আমাদের মোট জাতীয় আয় দাঁড়াতো ৪২ হাজার ৫১৪ কোটি ডলারে। যা মালয়েশিয়ায় ১৫ হাজার ৫ কোটি ডলার অর্থাৎ মালয়েশিয়ার মোট জাতীয় আয়ের তুলনায় 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে আমাদের মোট জাতীয় আয় ২.৮ গুণ বেশি হতো (লেখচিত্র ৪ দেখুন)। শুধু তাই নয়—মালয়েশিয়ার তুলনায় আমাদের জনসংখ্যা ৪ গুণ বেশি হলেও ২০১১ সালে আমাদের মাথাপিছু জাতীয় আয় হতো ৫,৫৯৮ ডলার যা মালয়েশিয়ায় ৫,১৯৯ ডলার (লেখচিত্র ৫ দেখুন), অর্থাৎ মালয়েশিয়ার তুলনায় মাথাপিছু ৩৯৯ ডলার বেশি। আর পিপিপি ডলারে হিসেবকৃত মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের ক্ষেত্রে বলা চলে ঘটনাটা ঘটতে পারতো বিপ্লবাত্মক (পরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে)। এ তো গেল 'বঙ্গবন্ধুসহ'

৯. হিসেব-পত্তর উপস্থাপনে যেখানেই 'আজ', 'আজকে', 'আজকের', 'এখন', 'এখনকার', 'বর্তমান', বর্তমানের'—এসব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেই ২০১১ সাল ধরে নিতে বা পড়তে হবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অর্থনীতির প্রধান দুই সূচক মোট দেশজ উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয়ে যে আমূল পরিবর্তন হয়ে মালয়েশিয়ার অর্থনীতিকে অতিক্রম করার মোটা দাগে মোদ্দা কথা। এখন একটু বিস্তারিত বিশ্লেষণে আসা প্রয়োজন যেখানে 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের সাথে আজকের (২০১১ সালে) মালয়েশিয়ার, 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের সাথে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের, এবং 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের সাথে মালয়েশিয়ার অর্থনীতির (যা কিছু মাত্রায় উপরে উল্লেখ করা হয়েছে) তুলনীয় অবস্থা দেখানো সম্ভব।

লেখচিত্র ১: মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি): ১৯৭০-২০১১
(২০০০ সালের সালের স্থির মূল্যে, কোটি ডলারে)

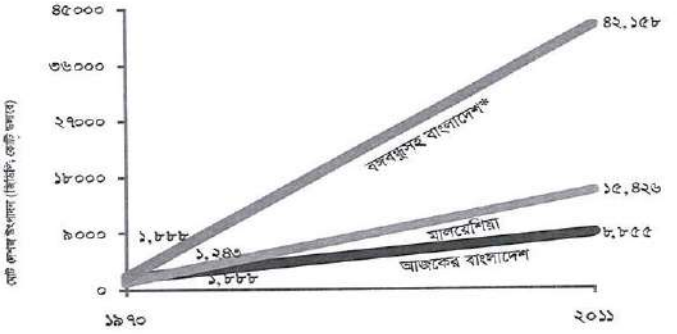

* প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত: ১৯৭৪ সালকে ভিত্তি বছর এবং বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ ধরা হয়েছে।

লেখচিত্র ২: মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন: ১৯৭০-২০১১
(২০০০ সালের স্থির মূল্যে, ডলারে)

* প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত: ১৯৭৪ সালকে ভিত্তি বছর এবং বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ ধরা হয়েছে।

লেখচিত্র ৩: বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার জনসংখ্যা (মিলিয়নে): ১৯৭০-২০১১

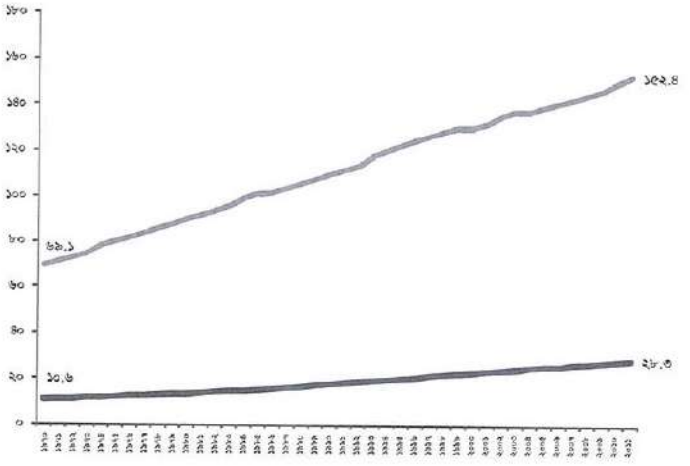

তথ্য উৎস: বাংলাদেশের জনসংখ্যার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন সনের "Statistical Year Book"; ১৯৭০ থেকে ১৯৭৩ প্রবন্ধকার কর্তৃক জনসংখ্যার গতি প্রবণতা ধরে হিসেবকৃত। আর মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে।

লেখচিত্র ৪: মোট জাতীয় আয় (জিএনআই): ১৯৭৩-২০১১
(২০০০ সালের স্থির মূল্যে, কোটি ডলারে)

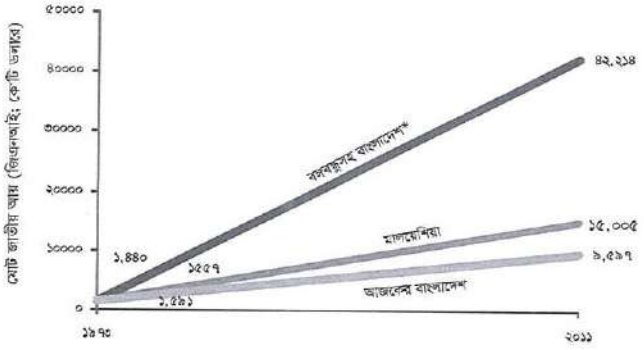

*প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত: ১৯৭৪ সালকে ভিত্তি বছর এবং বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ ধরা হয়েছে।

লেখচিত্র ৫: মাথাপিছু জাতীয় আয়: ১৯৭৩-২০১১
(২০০০ সালের স্থির মূল্যে, ডলারে)

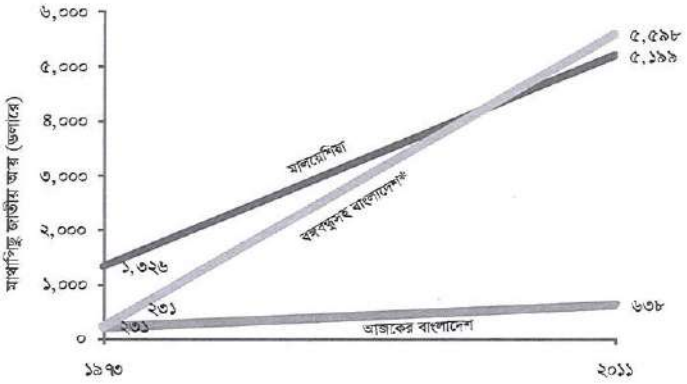

* প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত: ১৯৭৪ সালকে ভিত্তি বছর এবং বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ ধরা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হলে (যা অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে ইতোমধ্যে বিবৃত হয়েছে) অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' ২০১১ সালে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর সম্ভাব্য পরিমাণ হতো ৪২ হাজার ১৫৮ কোটি ডলার কিন্তু 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশে (২০১১ সালে) তার পরিমাণ মাত্র ৮ হাজার ৮৫৫ কোটি ডলার[১০] (লেখচিত্র ৩ দেখুন)। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে সেনা-স্বৈরশাসন ও স্বৈরশাসনের মোড়কে তথাকথিত গণতান্ত্রিকতার নামে লুণ্ঠনকারী rent-seeker গোষ্ঠী সৃষ্টিসহ অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখি বিদেশ থেকে আমদানিকৃত সাম্রাজ্যবাদপুষ্ট নয়া উদারবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতি দর্শন যা উন্নয়নবান্ধব নয় দরিদ্রবান্ধব তো নয়ই। আর এ জনকল্যাণবিমুখ স্বদেশবিমুখ উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়নের ফলে বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' ২০১১ সাল নাগাদ সম্ভাব্য মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ যা হতে পারতো তা আদৌ হয়নি, হয়েছে তার মাত্র ২১ শতাংশের সমপরিমাণ। অর্থাৎ মোটা দাগে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের তুলনায় 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশে আমরা ২০১১ সালে মোট দেশজ উৎপাদন হারিয়েছি (৪২,১৫৮ বিয়োগ ৮,৮৫৫) ৩৩ হাজার ৩০৩ কোটি ডলারের সমপরিমাণ। এ ক্ষতি বলা চলে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার কারণে মাত্র এক বছরের (২০১১ সালের) আনুমানিক ক্ষতি। এভাবে ১৯৭৫ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ৩৬ বছরে প্রতি বছরের ক্ষতি যোগ করলে পুঞ্জীভূত যে ক্ষতি হবে তার সম্ভাব্য পরিমাণ আমার হিসেবে ৩ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৮৯

১০. হিসেবপত্তরসংশ্লিষ্ট বিভ্রান্তি এড়ানোর স্বার্থে বাংলাদেশে ২০১১ সালের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) নিয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী ১৯৯৫-১৯৯৬-কে ভিত্তি বছর ধরে ২০১১ সালের মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ বলা হয়েছে ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ৫০ কোটি টাকা অর্থাৎ ৫,৫০২ কোটি ডলার (১ ডলারে ৭০ টাকা হিসেবে); আর ২০০৫-২০০৬ সালকে ভিত্তি বছর ধরে ২০১১ সালের মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ বলা হয়েছে ৬ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩৪২ কোটি টাকা অর্থাৎ ৯ হাজার ২৩৩ কোটি ডলার (দেখুন: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪, পৃ. ২৮৫-২৮৬, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার)। আমার হিসেবে ২০০০ সালের স্থির মূল্যে ২০১১ সালে বাংলাদেশে মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ হবে ৬ লক্ষ ১৯ হাজার ৮৫০ কোটি টাকা অর্থাৎ ৮ হাজার ৮৫৫ কোটি ডলার, যেটাই লেখচিত্র ১-এ দেখানো হয়েছে।

কোটি ডলার। ২০১১ সালে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন ৮ হাজার ৮৫৫ কোটি ডলার আর মালয়েশিয়ার ১৫ হাজার ৪২৬ কোটি ডলার অর্থাৎ মালয়েশিয়ার মোট দেশজ উৎপাদন আমাদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ অথচ বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং তার উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হলে ২০১১ সালে আমাদের মোট দেশজ উৎপাদন হতো মালয়েশিয়ার তুলনায় ২.৭৩ গুণ বেশি (আমাদের হতো ৪২ হাজার ১৫৮ কোটি ডলার;লেখচিত্র ১ দেখুন)। শুধু তা-ই নয় 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে মাথাপিছু দেশজ উৎপাদনে কল্পনাতীত উর্ধ্বগামিতা অর্জন সম্ভব হতো—'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশে ২০১১ সালে (২০০০ সালের স্থির মূল্যে) মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন ৫৮৮ ডলার আর মালয়েশিয়ার ৫,৩৪৫ ডলার (অর্থাৎ আমাদের তুলনায় ৯ গুণ বেশি), কিন্তু 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে ঐ মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন মালয়েশিয়াকে অতিক্রম করে হতো ৬,০৬১ ডলার (অর্থাৎ মালয়েশিয়ার তুলনায় মাথাপিছু ৭১৬ ডলার বেশি)। মাথাপিছু ব্যাপারটা নেহায়েতই গড়ের ব্যাপার। আর "গড়" (average, mean) মাথাপিছু বিষয়টি সত্য গোপন করে অথবা অন্যভাবে বলা চলে তা লুকিয়ে রাখার ভালো পদ্ধতি সুতরাং 'গড়' হিসেব প্রকৃত উন্নয়নের খুব ভালো মানদণ্ড নাও হতে পারে যদি ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য-বঞ্চনা ক্রমাগত বাড়ে (যেটাই আধুনিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেরই বাস্তব চিত্র)[১১]। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে একদিকে মাথাপিছু সম্ভাব্য দেশজ উৎপাদন হতো ৬,০৬১ ডলার আর অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের অন্তর্নিহিত বেশিষ্ট্যের কারণেই বৈষম্য হ্রাস পেত অনেকগুণ অর্থাৎ এই মাথাপিছু উচ্চ দেশজ উৎপাদন হতো বৈষম্য হ্রাসকারী মাথাপিছু উৎপাদন।

এতক্ষণ যা বললাম তা মূলত মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও মাথাপিছু দেশজ উৎপাদনের কথা। আসা যাক জাতীয় আয়ের (জিএনআই) প্রসঙ্গে। 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশে ২০১১ সালে মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ ৯ হাজার ৫৯৭ কোটি ডলার[১২] আর মালয়েশিয়ার ১৫ হাজার ৫ কোটি ডলার (অর্থাৎ আমাদের তুলনায় ১.৫৬ গুণ বেশি; দেখুন, লেখচিত্র ৪)। কিন্তু বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' ঐ একই সময়ে আমাদের মোট জাতীয় আয় হতো ৪২ হাজার ২১৪ কোটি ডলার যা মালয়েশিয়ার তুলনায় ২.৮ গুণ বেশি আর 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের তুলনায় ৪.৪ গুণ বেশি। অন্যভাবে বলা যায় ২০১১ সালে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয় হতো মালয়েশিয়ার চেয়ে ২৭ হাজার ২০১ কোটি ডলার বেশি, আর 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের তুলনায় সেটা হতো ৩২ হাজার ৬১৭ কোটি ডলার বেশি। 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ে এ উল্লম্ফন বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের কারণেই ঘটত। একই সাথে বঙ্গবন্ধু

---

১১. সাম্রাজ্যবাদী সকল দেশসহ আজকের সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রস্থল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও মাথাপিছু দেশজউৎপাদন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে যে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য-অসমতা ক্রমাগত বাড়ছে এবং একই সাথে গুটিকয়েক ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানেরহাতে ক্রমবর্ধমান অভূচ্চ হারে যে সম্পদ পুঞ্জীভূত হচ্ছে এবং ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা যে সমাজে বিভিন্ন ধরনের গুরুতর অস্থিরতা সৃষ্টি করছে, যা দূরনা করতে পারলে সাম্রাজ্যবাদসহ বিভিন্ন ধনী দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়তে পারে—এসব বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন জোসেফ স্টিগলিজ, পল ক্রুগম্যান, জেফরি স্যাকস, থমাস পিকেটি, চাক কলিন্স, নোয়াম চমস্কি ও আন্দ্রে ভ্লাটচেক প্রমুখ।

১২. আমার হিসেবে ২০০০ সালের স্থির মূল্যে ২০১১ সালে বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয় ৬ লক্ষ ৭১ হাজার ৭৯০ কোটি টাকা অর্থাৎ ৯ হাজার ৫৯৭ কোটি ডলার (১ ডলারে ৭০ টাকা হিসেব করা হয়েছে)। আর বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট অনুযায়ী ১৯৯৫-১৯৯৬ সালের স্থির মূল্যে ২০১১ সালে মোট জাতীয় আয় বলা হয়েছে ৪ লক্ষ ৯৬ কোটি টাকা অর্থাৎ ৬ হাজার ১ কোটি ডলার। ২০০৫-২০০৬ সালের স্থির মূল্যে হিসেব করলে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত ২০১১ সালে বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয় দাঁড়ায় ৭ লক্ষ ৫ হাজার ১৬৯ কোটি টাকা অর্থাৎ ১০ হাজার ৭৪ কোটি ডলার।

'বেঁচে থাকলে' জনবহুল বাংলাদেশে ২০১১ সালে মাথাপিছু জাতীয় আয় মালয়েশিয়াকে অতিক্রম করে ৫,৫৯৮ ডলারে দাঁড়াতো যেখানে মালয়েশিয়ার মাথাপিছু জাতীয় আয় ৫,১৯৯ ডলার আর 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশে তা মাত্র ৬৩৮ ডলার (২০০০ সালের স্থির মূল্যে)।

এ তো গেল মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বিষয়াদি। মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে এর চেয়ে অনেক ভালো পরিমাপক হলো মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় (percapita real national income)। ১৯৭৩ সালে মাথাপিছু প্রকৃত আয় (পিপিপি ডলারে) ছিল মালয়েশিয়ায় ১,৪০০ ডলার আর বাংলাদেশে ৩০০ ডলার (লেখচিত্র ৬)। 'বঙ্গবন্ধুহীন' ২০১১ সালের, বাংলাদেশে তা ১,৮৯০ ডলার আর মালয়েশিয়ার ১৩,৮২২ ডলার অর্থাৎ মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের ক্ষেত্রে ২০১১ সালের মালয়েশিয়া একই সময়ের বাংলাদেশের তুলনায় ৭.৩ গুণ বেশি এগিয়ে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' ২০১১ সালের বাংলাদেশে মাথাপিছু প্রকৃত আয় মালয়েশিয়াকে অতিক্রম করে ১৪,১০০ ডলারে দাঁড়াতো অর্থাৎ যেটা একই সময়ের মালয়েশিয়ার তুলনায় মাথাপিছু ২৭৮ ডলার বেশি আর 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের তুলনায় মাথাপিছু ১২,২১০ ডলার (অথবা ৭.৫ গুণ) বেশি (দেখুন, লেখচিত্র ৬)।

লেখচিত্র ৬: মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয়: ১৯৭৩-২০১১
(২০০৫ সালের স্থির মূল্যে, পিপিপি ডলারে)

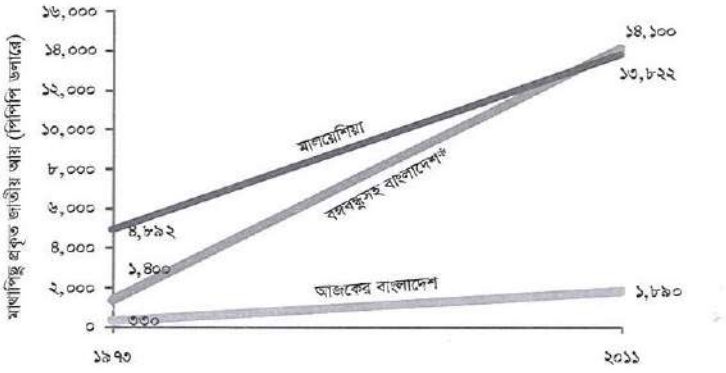

* প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত: ১৯৭৪ সালকে ভিত্তি বছর এবং বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ ধরা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধুর উদ্ভাবিত উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হলে আজকের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চেহারার যে আমূল পরিবর্তনের সম্ভাব্যতার কথা এতক্ষণ বিশ্লেষিত হলো তা অসম্পূর্ণ—পূর্ণাঙ্গ নয়। কারণ এতক্ষণ মোটাদাগে অর্থনীতির কিছু মানদণ্ডে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সমাজ পরিবর্তনের বিশেষত শ্রেণিকাঠামোর পরিবর্তন বিষয়াদি বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়নি। সমগ্রতার স্বার্থে সম্ভাব্য সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়টির বিশ্লেষণ উত্থাপন জরুরি। আসলে মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নিমিত্ত বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন (যার অধিকাংশই ইতোমধ্যে 'অনুসিদ্ধান্ত'সমূহে উল্লেখ করা হয়েছে) বাস্তবায়নের ফলে আমূল পরিবর্তনের প্রতিফলন ঘটত রাজনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র-সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে। বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' আর সেই সাথে তার উন্নয়ন-প্রগতি দর্শন ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত হলে কেমন হতো আজকের বাংলাদেশ সমাজের চেহারা? কেমনটি হতে পারতো শ্রেণি বিভক্ত সমাজের পরিবর্তিত শ্রেণিকাঠামো? আমার হিসেবে যা হতো তার কয়েকটি প্রবণতা-সম্ভাবনা নিম্নরূপ:

১. ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধের চার দশক পরে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সুনামগঞ্জের আব্দুল নূর, বীর প্রতীকের একমাত্র কন্যা (যার জন্ম ১৯৭১ সালে) হোসনে আরাকে রাস্তায় গোবর কুড়িয়ে ঘুটা বানিয়ে বিক্রি করে হাওড়ের জীর্ণ কুটিরে অনাহারে-অর্ধাহারে দিনাতিপাত করতে হতো না। ঢাকার নওয়াবগঞ্জের শহীদ আমির হোসেন, বীর প্রতীকের একমাত্র কন্যা সেলিনা খাতুনকে কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) প্রকল্পে কোদাল হাতে মাটি কেটে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো না। মুক্তিযোদ্ধা-সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা-মুক্তিযুদ্ধের সময় জীবন দিতে প্রস্তুত সহানুভূতিশীল মানুষদের দরিদ্র-বঞ্চিত-শোষিত-নিষ্পেষিত হতে হতো না। বয়োবৃদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা ভ্যান চালায় আর ভ্যানে বসে রাজাকার সিগারেট ফুঁকে বলে "এই ব্যাটা মুক্তিযোদ্ধা জোরে চালাতে পারিস না"—এ অবস্থা কখনও হতো না। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের কারণে বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক (১৯৭৩ সালে) খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা বা তার স্ত্রী, কন্যা-পুত্র বা এখনও জীবিত পিতা-মাতাদের প্রায় ৫৮ শতাংশ আর্থিকভাবে অসচ্ছল থাকতেন না।[১৩]

২. মহান মুক্তিযুদ্ধে ইজ্জতহানি-সম্ভ্রমহানির শিকার ১০ লক্ষ নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদায় সমাজে বসবাসের সকল সুযোগ সৃষ্টি করা হতো।

৩. ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবনাসমূহ বাস্তবায়িত হওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক-মানবিক-চেতনায়ন বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে মানব মুক্তি ও স্বাধীনতা চেতনা-সংশ্লিষ্ট বোধ বৃদ্ধি পেত এবং তা কার্যকরভাবে দেশ-সমাজ গঠনে নিয়ামক ভূমিকা রাখতো। এসবের ধনাত্মক প্রতিফল হতো অনেক গভীর-বহুমুখী-বহুবিস্তৃত। এবং বংশপরম্পরা।

৪. সংবিধানের ১১, ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় শাসন (local governance) উৎসাহিত হতো এবং ঐসকল প্রতিষ্ঠানে কৃষক, শ্রমিক এবং নারীরা যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব করতেন; নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসন ভার অর্পণ করা হতো এবং স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান স্থানীয় প্রয়োজনে করারোপসহ বাজেট প্রণয়ন ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হতো। এ সবের প্রকৃত অভিঘাত যা দাঁড়াতো তা হলো জনগণই হতেন প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত মালিক এবং দেশের উন্নয়ন ও প্রগতি কর্মকাণ্ডে দেশের সাধারণ মানুষের অভিপ্রায়ই নিয়ামক ভূমিকা পালন করত। আর ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন উন্নয়নে জনগণের প্রকৃত অংশীদারিত্ব বাড়তো অন্যদিকে দুর্নীতি-লুণ্ঠন-পরজীবী প্রকৃতির উন্নয়ন-প্রগতিবিরোধী কর্মকাণ্ড উচ্ছেদ হয়ে যেতো। "মানুষ নিজেই নিজের ইতিহাস রচনা করতেন"—এটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শনের নিহিতার্থ।

৫. মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সবার জন্য সব ধরনের চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান হেতু স্থূল জন্মহার (crude birth rate)এবং স্থূল মৃত্যুহার (crude death rate)—উভয়ই হ্রাস পেত। এসবের ফলে দারিদ্র্য-উদ্ভূত মৃত্যুহার বহুগুণ হ্রাস পেত। জন্ম ও মৃত্যু হার হ্রাস পেলেও আজকের জনসংখ্যা হয়তো বা ১৫ কোটিতেই থাকতো কিন্তু জনসংখ্যায় বড় ধরনের গুণগত পরিবর্তন ঘটত। যা হতো তা হলো এই ১৫ কোটি জনসংখ্যাটি নিঃসন্দেহে

---

১৩. এসব নিয়ে বিস্তারিত দেখুন জনতা ব্যাংক কর্তৃক গবেষিত ও প্রকাশিত আকর গ্রন্থ "একাত্তরের বীরযোদ্ধাদের অবিস্মরণীয় জীবনগাথা: খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা স্মারকগ্রন্থ", জনতা ব্যাংক লিমিটেড, জুন ২০১২, পৃ. ১-৮।

উচ্চতর গুণমান সমৃদ্ধ আলোকিত জনসম্পদে রূপান্তরিত হতো ফলে মানুষের জীবন যাত্রা ও বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির গুণগত মানে আমূল পরিবর্তন আসতো। আর এই রূপান্তর দেশজ মেধা-মননের বিকাশসহ দেশজ উৎপাদন-পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার চেহারাটাই পাল্টে দিতো (অন্তত শ্রমের অধিকতর ফলপ্রদতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারণে)। এ সবের দীর্ঘমেয়াদি প্রতিফল হতো এত দিনে অন্য এক বাংলাদেশ বিনির্মিত হয়ে যেতো—যে বাংলাদেশকেই বঙ্গবন্ধু 'সোনার বাংলা' নামে আখ্যায়িত করতেন।

৬. জনসংখ্যা ১৫ কোটি থাকতো তবে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়নের ফলে মোট জনসংখ্যায় গ্রামের জনসংখ্যা ব্যাপক হ্রাস পেত। গ্রাম তো আর আজকের মত গ্রাম থাকতো না। গ্রামের মানুষ নগরের নাগরিক সমাজের সকল সুবিধা গ্রামে বসেই পেতেন—পেতেন বিদ্যুৎ, পেতেন জ্বালানি সুবিধা, পেতেন সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালির বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক সুবিধাদি, পেতেন বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষার সুযোগ, পেতেন আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা, পেতেন আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ গণযোগাযোগ ও ব্যক্তি যোগাযোগের সকল মাধ্যমে সহজ অভিগম্যতা (অর্থাৎ যাকে বলে PSURA, providing scientific urban amenities in rural areas)। এ সবের ফল দাঁড়াতো একদিকে গ্রামের মানুষের সুস্থ আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লম্ফন। আর অন্যদিকে আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭২ শতাংশ এখন গ্রামে বাস করেন যা মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে ২৮ শতাংশ (যেখানে ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মোট জনসংখ্যায় গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৯২ শতাংশ একই সময়ে মালয়েশিয়ায় তা ছিল ৬৭.৩ শতাংশ)। উপরের বর্ণিত বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শনটি গ্রামের মানুষের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হলে গ্রামের চিত্র আমূল পাল্টে যেতো—সংজ্ঞাগতভাবেই গ্রামকে আর প্রচলিত অর্থের গ্রাম বলা যেতো না এবং গ্রাম-শহরের জনসংখ্যার এখন যে অনুপাতটা আছে (৭২:২৮) অর্থাৎ মোট ১৫ কোটি মানুষের ৭২ শতাংশ গ্রামে বাস করেন, আর বাকি ২৮ শতাংশ শহরে বাস করেন—সেটা ঠিক উল্টো হতো অর্থাৎ জনসংখ্যায় গ্রাম-শহরের অনুপাতটা হতো ২৫:৭৫—এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে আজকের মুক্তবাজার অর্থনীতিতে গ্রাম থেকে শহরে যে গলাধাক্কা অভিবাসন হচ্ছে এবং সেই সাথে গ্রাম থেকে শহরে আসা অভিবাসিত এই মানুষ অনানুষ্ঠানিক খাতে স্বল্প মজুরিতে কাজ করে প্রথমে দরিদ্র থেকে নিঃস্ব হচ্ছেন আর তারপরে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে ভিক্ষুকে রূপান্তরিত হচ্ছেন—এই প্রক্রিয়া থাকতো না; কারণ গ্রাম থেকে মানুষ কোনো কারণে শহরে এলেও সে মানুষ অপেক্ষাকৃত জ্ঞানসমৃদ্ধ সুস্থ-সবল দক্ষ-প্রশিক্ষিত আলোকিত মানুষ হিসেবে নিদেনপক্ষে শিল্পায়নের আওতায় থাকতেন এবং উচ্চতর জীবনমানের অধিকারী হতেন।

৭. বৈষম্য হ্রাসউদ্দিষ্ট ও গ্রাম-শহরের প্রভেদ দূরীকরণনিমিত্ত কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসহ (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৬) বঙ্গবন্ধু ঘোষিত (১৯৭৫ সালে) গণমুখী সমবায় আন্দোলন (যার অন্তর্ভুক্ত ছিল বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রামীণ সমবায়, কৃষক সমবায়, তাঁতী সমবায়সহ ১৯৭২ এর সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গুরুত্বক্রম অনুযায়ী রাষ্ট্রে উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানার ধরনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানার পরেই সমবায়ী মালিকানার প্রতিশ্রুতি) ও কল-কারখানায় শ্রমিকের যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে থাকতো না কোনো ভূমিহীন কৃষক, থাকতো না জল-জলায় মালিকানাহীন প্রকৃত দরিদ্র কোনো জেলে, থাকতো না দরিদ্র কোনো মেহনতি শ্রমিক।

৮. বহুমুখী-বহুরূপী দারিদ্র্যের অনেকগুলোর কোনো অস্তিত্বই থাকতো না, দারিদ্র্যের কিছু কিছু রূপ প্রশমিত হতো এবং আস্তে আস্তে সেগুলোও বিলুপ্ত হতো। বহুমুখী দারিদ্র্যের এসব রূপের মধ্যে আছে আয়ের দারিদ্র্য, ক্ষুধার দারিদ্র্য, কর্মহীনতার দারিদ্র্য, স্বল্প-মজুরির দারিদ্র্য, আবাসনের দারিদ্র্য, শিক্ষার দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যের দারিদ্র্য, অস্বচ্ছতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, শিশুদারিদ্র্য, প্রবীণ মানুষের দারিদ্র্য, নারী-প্রধান খানার দারিদ্র্য, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকের দারিদ্র্য, ভাসমান মানুষের দারিদ্র্য, প্রতিবন্ধী মানুষের দারিদ্র্য, 'মঙ্গা' এলাকার মানুষের দারিদ্র্য, বহিঃস্থ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য, বস্তিবাসী ও স্বল্প-আয়ের মানুষের দারিদ্র্য, পরিবেশ-প্রতিবেশ বিপর্যয়ের দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, প্রান্তিকতা থেকে উদ্ভূত দারিদ্র্য (অনানুষ্ঠানিক সেক্টর, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, আদিবাসী মানুষ, নিম্নবর্ণ-দলিত, 'পশ্চাৎপদ'-পেশা, চর-হাওর-বাওর-এর মানুষ), রাজনৈতিক দারিদ্র্য (রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ না করতে পারার কারণে দারিদ্র্য), রাষ্ট্র-সরকার পরিচালনাকারীদের প্রতি আস্থাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, মানসকাঠামোর (mind set) দারিদ্র্য ইত্যাদি।[১৪]

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধু উদ্ভাবিত উন্নয়নদর্শন বাস্তব রূপ নিলে উপরে যা যা উল্লেখ করেছি সবকিছুই মোটামুটি তেমনটিই হতো—কারণ এ সম্ভাবনা বাস্তব, কল্পনাপ্রসূত কিছু নয়। আর সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোটাই সম্পূর্ণ বদলে যেতো। শ্রেণিসমাজের রূপান্তর ঘটত এ কারণেও যে ১৯৭২ এর সংবিধানের চার মূল স্তম্ভে ছিল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ভিত্তিক মানুষে-মানুষে বৈষম্য হ্রাসসহ সমজাতীয় বিষয়াদি নিশ্চিতকরণের প্রতিশ্রুতি।

আজকের 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোটি কেমন আর কেমনটা হতো ঐ শ্রেণিকাঠামো যদি বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হতো ('বঙ্গবন্ধু 'যদি বেঁচে থাকতেন')? এ সংশ্লিষ্ট হিসেবপত্তর কেউ আগে করেছেন বলে আমার জানা নেই। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার হিসেবপত্তরভিত্তিক ২০১১ সালের দিকের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামো এবং বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হলে ঐ কাঠামো কেমন চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের হতো[১৫] তা যথাক্রমে ছক ২ ও ছক ৩-এ দেখানো হয়েছে।

'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের আর্থসামাজিক কাঠামোটি অতিমাত্রায় শ্রেণিভিত্তিক এবং চরম বৈষম্যমূলক। শুধু তা-ই নয় এ শ্রেণি বৈষম্য ক্রমবর্ধমান। 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোর বিকাশ প্রবণতা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আমাদের সার্বিক দারিদ্র্য-বৈষম্য-বঞ্চনা-অসমতার অধোগতি হচ্ছে। সেই সাথে দেখা যাচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্নগামী প্রবণতা এবং মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্ন-

---

১৪. দারিদ্র্যের বহুরূপ-বহুমুখ এবং সংশ্লিষ্ট কারণ-পরিণামসহ দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৬, "বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে"। ঢাকা : মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

১৫. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোর শ্রেণিভিত্তিক আমার হিসেব পত্তর নিয়ে যে কেউ ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। মুক্ত চিন্তার স্বাধীনতা সবারই আছে। তবে ভিন্নমত অথবা দ্বিমত পোষণকারীদের এ বিতর্কে অবতীর্ণ হবার আগে অনুরোধ করবো এ প্রশ্নের উত্তর দিতে যে তারা বিশ্বাস করেন কিনা যে ১৯৭২ এর সংবিধানে প্রতিশ্রুত সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার থেকে যারা বঞ্চিত তারাই দরিদ্র। আর একই সাথে অনুরোধ করবো মানেন কিনা যে দারিদ্র্যের বহুরূপ আছে, দারিদ্র্য বহুমুখী (যেসব রূপের কথা উপরে 'জ' এ উল্লেখ করেছি)। এসব রূপের যেকোনো একটি বা একাধিক রূপ যার জন্য প্রযোজ্য তিনিই দরিদ্র, আর তার জীবনের অবস্থাটাই দারিদ্র্য।

ছক ২: আজকের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামো, ২০১১ (মোট জনসংখ্যা ১৫ কোটি)

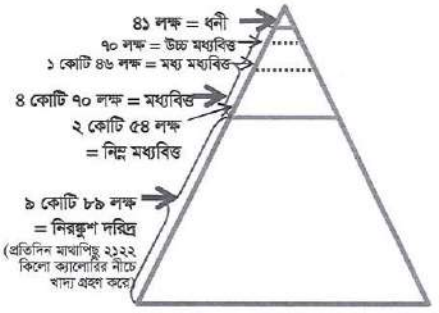

উৎস: আবুল বারকাত, "বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা: একীভূত, রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে", পৃ: ৪৭, ২০১২ সালের শ্রেণি পিরামিডকে ২০১১ সালের জন্য হিসেব করা হয়েছে।

ছক ৩: 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামো, ২০১১ সাল নাগাদ কেমন হতো? (মোট জনসংখ্যা ১৫ কোটি)

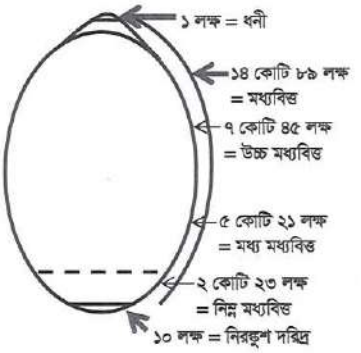

উৎস: প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত।

মধ্যবিত্তের দিকে ধাবিত হওয়া, নিম্ন-মধ্যবিত্তের গতি দরিদ্রমুখী আর সম্পদ পুঞ্জীভূত হচ্ছে কিছু ধনিক শ্রেণির মানুষের হাতে, যারা মোট জনসংখ্যার ২.৭ শতাংশ, আর এদেরই মধ্যে ১০ শতাংশ দখল করে আছে ধনীদের মোট বিত্তের ৯০ শতাংশ বিত্ত-সম্পদ (অর্থাৎ এরা হলো দেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোর যে মই সে মইয়ের উপরের ১ শতাংশ মানুষ যাদের বলা হয় super-duper elite)। অর্থাৎ এখানে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে জনসংখ্যার অত্যুচ্চ এক শতাংশের এক সমীকরণ যাকে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ আখ্যায়িত করেছেন"Of the 1%, for the 1%, by the 1%,"হিসেবে,এমনকি পুঁজিবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতিতে অনুরূপ অবস্থা দেখা যায় সর্ব্বোচ ধনী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে সর্ব্বোচ বিত্তশালী ১ শতাংশ আমেরিকান তাদের দেশের মোট বিত্ত-সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের মালিক; যেখানে ক্রমবর্ধমান অসমতা (inequality) এবং সুযোগের অভাব (lack of opportunity) হেতু ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে আর গরিবরা হচ্ছে আরও গরিব।

'বঙ্গবন্ধুহীন' ২০১১ সালের দিকের ১৫ কোটি মানুষের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোটা নিম্নরূপ (ছক ২ দেখুন) : মোট জনসংখ্যার ২.৭ শতাংশ (অর্থাৎ ৪১ লক্ষ) মানুষ ধনী আর ১ শতাংশ হবে যাকে বলে সুপার-ডুপার ধনী, ৩১.৩ শতাংশ মধ্যবিত্ত (মোট ৮ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ), আর ৬৫.৯ শতাংশ নিরঙ্কুশ দরিদ্র (absolute poor, যাদের সংখ্যা ৯ কোটি ৮৯ লক্ষ)। অর্থাৎ 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশ সুস্পষ্টভাবে ধনী-দরিদ্রে বিভাজিত। আর আর্থ-সামাজিক শ্রেণি মই-এর অত্যুচ্চ স্থানে অবস্থিত মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশ মানুষ অত্যুচ্চ ধনীই শুধু নয় তারা rent seeking-এর বিভিন্ন পথ-পদ্ধতিতে সমগ্র অর্থনীতি ও রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করে ফেলেছে। এরা মোট জাতীয় পারিবারিক সম্পদ ও আয়ের (কালো টাকাসহ) ৬০-৭০ শতাংশের মালিক। আর তার বিপরীতে দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য (যা বহুমুখী)—বৈষম্য-অসমতা বেড়েছে ও ক্রমাগত বাড়ছে। 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণি-সমীকরণটা দাঁড়িয়েছে এমন যে লুটেরা দুর্বৃত্ত, পরজীবী, অনুপার্জিত আয়কারী, অন্যের সম্পদ হরণকারী-আত্মসাৎকারী, ফাও-খাওয়া এই rent-seekers গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত বাস্তব উন্নয়ন নীতি-দর্শনটাই এমন যে ধনী আরও ধনী হবে, মধ্যবিত্তের অধোগতি হবে, এবং দরিদ্র মানুষ দরিদ্রতর হয়ে নিঃস্ব হবেন আর তার পরে হবেন ভিক্ষুক (অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের নিঃস্বায়ন প্রক্রিয়া থেকে ভিক্ষুকায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে)। এসবই 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামো রূপান্তরের মূলকথা।

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধুর "মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণ ও বৈষম্য হ্রাসকরণ-উদ্দিষ্ট উন্নয়নদর্শন" কার্যকর হলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোটা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ও প্রগতিবাদী হতো—এতে আমার কোনোই সন্দেহ নেই। বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হলে ২০১১ সাল নাগাদ ১৫ কোটি মানুষের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর আমূল পরিবর্তন-রূপান্তর ঘটে যেমনটি দাঁড়াতো তা নিম্নরূপ (দেখুন ছক ৩, আর তুলনামূলক অবস্থার জন্য লেখচিত্র ৫ দেখুন): ২০১১ সালের বাংলাদেশে মোট ১৫ কোটি জনসংখ্যার যেখানে ২.৭ শতাংশ ধনী সেটা 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে কমে দাঁড়াতো ০.০৭ শতাংশ (অর্থাৎ ৪১ লক্ষের বিপরীতে মাত্র ১ লক্ষ মানুষ); শ্রেণিকাঠামোর একদম নিচতলার নিরঙ্কুশ দরিদ্র মানুষের সংখ্যা যেখানে মোট জনসংখ্যার ৬৫.৯ শতাংশ (মোট ৯ কোটি ৮৯ লক্ষ মানুষ) সেটা 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে কল্পনাতীত হ্রাস পেয়ে মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৭ শতাংশে দাঁড়াতো (অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের সংখ্যা হত মাত্র ১০ লক্ষ); সেইসাথে সংখ্যাগত ও গুণগত দিক থেকে সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তন ঘটত সেটা হলো মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে পরিবর্তন রূপান্তর—২০১১ সালের হিসেবে মোট জনসংখ্যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে মানুষের সংখ্যা ৩১.৩ শতাংশ (মোট ৪ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ) যা 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে প্রায় তিনগুণ বেড়ে মোট জনসংখ্যার ৯৯.৩ শতাংশে উন্নীত হতো (অর্থাৎ মোট মধ্যবিত্তের সংখ্যা হতো ১৪ কোটি ৮৯ লক্ষ মানুষ)। অর্থাৎ 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে 'বঙ্গবন্ধুহীন' ২০১১ সালের বাংলাদেশের তুলনায় একদিকে ধনী মানুষের মোট সংখ্যা ৪১ গুণ কমে যেতো, অন্যদিকে নিরঙ্কুশ দরিদ্র মানুষের মোটসংখ্যা প্রায় ৯৯ গুণ কমে যেতো, আর মধ্যবিত্ত মানুষের মোটসংখ্যা ৩.২ গুণ বাড়তো। শুধু তাইই নয় যে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের তুলনায় ধনী ও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বহুগুণ হ্রাসের ফলে মধ্যবিত্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত সেই সাথে মধ্যবিত্তের মধ্যে যে তিনভাগ আছে অর্থাৎ উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মধ্য-মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত এখানেও ঘটত আমূল কাঠামোগত রূপান্তর। 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের তুলনায় উচ্চ মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত ১০.৬ গুণ (২০১১ সালের বাংলাদেশের ৭০ লক্ষ থেকে বেড়ে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে ৭ কোটি ৪৫ লক্ষ মানুষে উন্নীত হতো), মধ্য-মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত ৩.৬ গুণ (মোট ১ কোটি ৪৬ লক্ষ থেকে বেড়ে ৫ কোটি ২১ লক্ষ মানুষ), আর সংগত কারণেই মধ্যবিত্তের উপর তলায় এত বৃদ্ধির ফলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে মানুষের সংখ্যা ২০১১ সালের তুলনায় প্রায় ১৪ শতাংশ হ্রাস পেত (মোট ২ কোটি ৫৪ লক্ষ থেকে কমে ২ কোটি ২৩ লক্ষ মানুষে দাঁড়াতো)। অর্থাৎ এক কথায় বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে'

লেখচিত্র ৭: 'বঙ্গবন্ধুহীন' ও 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোতে বিভিন্ন শ্রেণির তুলনামূলক অবস্থা: দু'অবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত মোট ১৫ কোটি মানুষের শতকরা হার, ২০১১

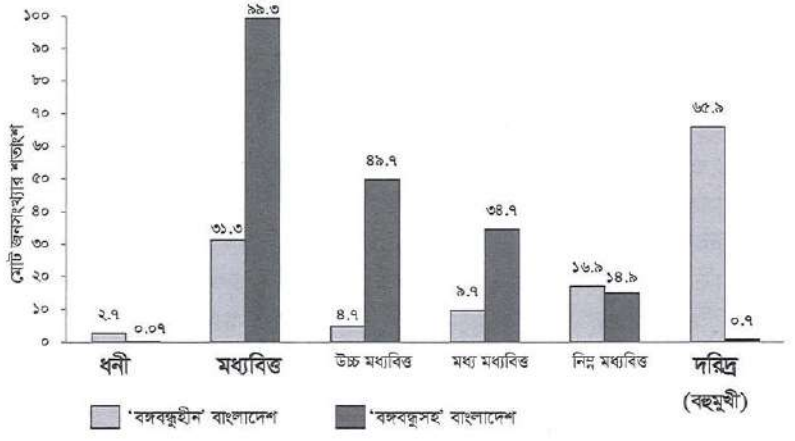

এবং "বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন" বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোর প্রগতিবাদী আমূল রূপান্তর ঘটত—এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বাংলাদেশের বিপরীতে মালয়েশিয়া অর্থনৈতিকভাবে অনেক গুণ বেশি উন্নতি করেছে একথা সত্য তবে আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোতে তেমন কোনো রূপান্তর ঘটেনি যা বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বাংলাদেশে অবশ্যম্ভাবীভাবেই ঘটত। আর তা ঘটত "বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন" বাস্তবায়নের কারণেই অন্য কোনো অলৌকিক কারণে নয়।

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়ন হলে (যার ভিত্তি হিসেবে বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের কথা ইতোপূর্বে উল্লেখসহ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছি) বাংলাদেশের অর্থনীতিসহ সমাজের শ্রেণিকাঠামোতে যে আমূল প্রগতিশীল রূপান্তর ঘটত সে বিষয়ে নিশ্চিত উপসংহারে উপনীত হবার আগে আরও কিছু বিশ্লেষণাত্মক বিষয়াদি উল্লেখ জরুরি। 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোর প্রগতিশীল পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশকারী আরও কয়েকটি বিষয় নিম্নরূপ:

১. জাতীয় সম্পদ ও উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানা কাঠামোটি সংবিধানিকভাবেই গুরুত্বক্রম অনুসারে যথাক্রমে 'রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী, ও (নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে) ব্যক্তিগত হবে'—প্রতিশ্রুতির কারণে সম্পদের সবচে বেশি অংশের মালিক হতো রাষ্ট্র, তারপর সমবায়। তারপরেই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যক্তি। আর এ কারণেই জাতীয় সম্পদের ও উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তি-খানা-পরিবার পর্যায়ে মালিকানাজনিত তেমন কোনো বৈষম্য থাকত না।

২. ব্যক্তিগত-খানা-পরিবারপর্যায়ে জাতীয় সম্পদের যে অংশটুকু থাকতো তা বণ্টন বৈষম্য হ্রাস নীতি অথবা বণ্টন ন্যায্যতার নীতির কারণে শ্রেণি-কাঠামো মই-এর উপরের দিকে পুঞ্জীভূত হবার কোনো সুযোগই থাকত না। যেমন ঐ শ্রেণি মই-এর (class ladder) উপরের সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ ব্যক্তি-খানা-পরিবার-এর হাতে থাকতো উক্ত সম্পদ ও আয়ের বড়জোর ১৫ শতাংশ (যা এখন ৭০-৮০ শতাংশ) আর শ্রেণি মই-এর সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ-এর হাতে থাকতো উক্ত সম্পদ ও আয়ের ৭-৮ শতাংশ। একই সাথে উল্লিখিত মোট জাতীয় সম্পদ ও খানার আয়ের ৭৭-৭৮ শতাংশ থাকতো ৮০ শতাংশ ব্যক্তি-খানা-পরিবারের হাতে। জাতীয় খানাভিত্তিক আয়ের চেহারাটাও আমূল পাল্টে অনুরূপ হতো। সুতরাং জাতীয় সম্পদ ও জাতীয় আয়ে মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যক্তি-খানা-পরিবারভিত্তিক তেমন কোনো বৈষম্য থাকতো না বললে অত্যুক্তি হবে না।

৩. জন্মসূত্রে মানুষের দরিদ্র হবার কোনো সুযোগ থাকতো না। বংশ পরম্পরা দারিদ্র্য বলতে কিছু থাকতো না। দরিদ্র হিসেবে যারা থাকতেন (মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৭ শতাংশ) তার কারণ হতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ (অতিবৃষ্টি, বন্যা, অনাবৃষ্টি, নদী ভাঙ্গন, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি) এবং ব্যক্তিগত (শারীরিক, মানসিক ইত্যাদি) কারণে সৃষ্ট অস্থায়ী-স্বল্পকালীন-আপৎকালীন (temporary) দরিদ্র অথবা অদরিদ্রের কিছু সময়ের জন্য দরিদ্র হওয়া। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর "মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণভিত্তিক বৈষম্যহ্রাসকারী অর্থনৈতিক নীতি-দর্শন" আর একই সাথে শক্তিশালী ও কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা (strong and efficient social protection system)নীতি-কৌশল অবলম্বনের ফলে স্থায়ীভাবে কারও দরিদ্র থাকার কোনো সুযোগই থাকতো না। এবং এটা জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ-বয়স-পেশা নির্বিশেষে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হতো।

৫. উপসংহার

এ প্রবন্ধে অর্থনীতি ও সমাজ বিকাশসংশ্লিষ্ট হিসেবপত্তরসহ যা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি তা একদিকে দেখায় বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' আমরা সম্ভাব্য কোন উচ্চতায় পৌঁছে যেতাম আর অন্যদিকে দেখায় বঙ্গবন্ধু হত্যার দীর্ঘমেয়াদি সম্ভাব্য আংশিক প্রতিফল। বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং সেইসাথে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হলে ২০১১ সাল নাগাদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির সব মানদণ্ডেই আমরা কাঙ্ক্ষিত শিখরে পৌঁছে যেতাম। আমরা অতিক্রম করতাম আধুনিক মালয়েশিয়াকে—শুধু অর্থনীতির মানদণ্ডেই নয়, সামাজিক বৈষম্যহ্রাসের সকল মানদণ্ডে। কিন্তু ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করা হয়; ইতিহাসের চাকা উল্টে দেওয়া হয়। পিছিয়ে গেলাম, আমরা অনেক পিছে পড়লাম। এর জন্য কে দায়ী, কীভাবে দায়ী, কী তারা চেয়েছিল সে প্রসঙ্গে নির্মোহ বস্তুনিষ্ঠ কিছু বিশ্লেষণ ইতোমধ্যে উত্থাপন করেছি, আর বাকিটা দায়িত্বশীল-দেশপ্রেমিক-জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ ইতিহাস রচয়িতাসহ সামাজিক বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে জনগণকে অবহিত করবেন। তবে এক্ষেত্রে বিশ্লেষণভিত্তিক আমার কয়েকটি উপসংহার নিম্নরূপ:

১. যারা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিল তারাই বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্যের মূল পরিকল্পনাকারী ষড়যন্ত্রকারী।

২. সাম্রাজ্যবাদ—সমাজতন্ত্রবিরোধী তো বটেই এমনকি অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদবিরোধী (secular nationalism) বিধায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদসহ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদই 'বঙ্গবন্ধুসহ' সোনার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত অভিযান চালিয়েছিল এবং তাদের এ কর্মকাণ্ড এখনও অব্যাহত।

৩. বঙ্গবন্ধুর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে—তা মুক্তিযুদ্ধের আগের বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের ৩৩ বছরে (১৯৩৮-১৯৭১) হোক আর মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সাড়ে তিন বছরে (১৯৭২-১৯৭৫) হোক—যারা তাঁর আদর্শের শত্রু ছিল তারাই ঐ হত্যা পরিকল্পনাকারী।

৪. বঙ্গবন্ধুর আদর্শের শত্রু—বঙ্গবন্ধু হত্যার পরিকল্পনাকারীরাই প্রথমে বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম থেকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত প্রধান শত্রু ছিল। এবং পরে তারাই মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের চেতনায় বাংলাদেশকে মাথা তুলে দাঁড়াতে না দেওয়ার এজেন্ট, তারাই বাংলাদেশকে মর্যাদাহীন অকার্যকর রাষ্ট্র ও দরিদ্র দেশ হিসেবে রূপান্তরিত করা ও তা জিইয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল।

৫. বঙ্গবন্ধুকে যারা হত্যা করেছিল তারা শুধু বঙ্গবন্ধু নামক স্বাধীনচেতা-দেশপ্রেমিক মুক্ত-স্বাধীন দেশ-রাষ্ট্র-সমাজ গঠনের দর্শন প্রণেতা ও তা বাস্তবায়নকারী এক ঐতিহাসিক বিশাল ব্যক্তিত্বকেই হত্যা করেনি, তারা হত্যা করেছে একটি দ্রুত উদীয়মান প্রগতিশীল রাষ্ট্র-সমাজের ভবিষ্যৎ।

৬. হত্যার সময়কাল হিসেবে বেছে নিয়েছিল সম্ভাব্য দ্রুততম হারে বৈষম্যহ্রাসসহ অর্থনৈতিক প্রগতির সময়কাল—এ ঐতিহাসিক সময় চয়নটিও গভীরতম এক পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন মাত্র অর্থাৎ এসব করে তারা হত্যা করেছে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দ্রুততম বিকাশের ঐতিহাসিক যুগপর্বকে। আমার হিসেবপত্তরসহ ইতিহাসই তো যা কিছু বললাম তার সাক্ষ্য বহন করছে।